বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩১ ৩০ আগস্ট - ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্বনন্দিত মাদার তেরেজা

মহাপুরুষ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর একান্ত সান্নিধ্যে

বন ও বনভূমির মানুষপ্রেমিক ফাদার হোমরিক সিএসসি

২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

মা, তোমাকে অজস্র প্রণাম

প্রয়াত মারীয়া সরকার
মৃত্যু : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াত স্বামী : জেরোম সরকার
(প্রয়াত আন্তনী মন্তি গমেজ ও
প্রয়াত ম্যাগডালেনা গমেজ-এর মেজ কন্যা)
ধর্মপল্লী : লক্ষীবাজার, ঢাকা

আর তো তুমি মরণাপন্ন রোগিদের নিয়ে
হাসপাতালে হাসপাতালে দৌড়াবে না
আর তো তুমি সবার জন্য গ্রোটোর সামনে দাঁড়িয়ে
একটানা প্রার্থনা করবে না।
তোমার সহজ-মধুর সম্বোধনটি কানের কাছে
বাজতে থাকবে।

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার (প্রয়াত) কনিষ্ঠ পুত্র

শোকার্ত স্বজন
জন, বেবী, মারীয়া (কৃপা), হিউবার্ট (তীর্থ), তিমথী (অর্ঘ্য)
ফিলিপ, জয়া, এলেন ও এঞ্জেলা
মালা, মিঠু ও আর্থার।

বিজ্ঞ/১৩৩/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৩১
■■■■■ ৩০ আগস্ট - ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ১৫ - ২১ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

‘আমাদের সাধু’ পাবার প্রত্যাশায়

মহৎ মানুষের জীবনাদর্শ আমাদেরকে মহৎ হতে শিক্ষা দেয়। ঠিক তেমনিভাবে সাধু-সাধ্বীদের জীবন কথা আমাদেরকে সাধুতার পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করে। কোলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা এবং বাংলার প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর সহজ-সরল, নম্র-ভদ্র, দীন-হীন, ত্যাগময় এবং দানশীল জীবন-যাপন সাধুতার পথেই বিচরণ। দীন-দরিদ্রদের মা ও মানবতার জননী মাদার তেরেজার সুন্দর, পবিত্র ও পরার্থপর জীবনের দৃষ্টান্ত সমুজ্জ্বল রাখতে বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলী মাদারের মৃত্যুর মাত্র ১৯ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে তাকে কোলকাতার সাধ্বী বলে ঘোষণা দেয়। মাদার তেরেজাকে কোলকাতার সাধ্বী ঘোষণা করাতে বাংলা ভাষাভাষী সকলেই যেমনি আনন্দিত হয়েছে তেমনি আশান্বিত হয়েছে যে খুব শিঘ্রই আমরা বাংলাদেশীরা আমাদের নিজেদের একজন সাধু পাবো। সকল সাধু-সাধ্বীর প্রতি যথার্থ ভক্তি শ্রদ্ধা থাকলেও আমরা সর্বদা আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে প্রত্যাশা করি।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি জন্ম গ্রহণকারী থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর এ বছর অর্থাৎ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পালিত হচ্ছে জন্মশতবার্ষিকী। মাত্র ৫৭ বছর বয়সে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কর্ম ও জীবন আরো বেশি কীর্তিত হতে থাকে। খ্রিস্টভক্তগণ অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় স্মরণ করতে থাকে তাদের প্রিয় আর্চবিশপকে। আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে খ্রিস্টভক্তগণ তাঁকে সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের অনুরোধ করেন। খ্রিস্টভক্তগণ প্রত্যাশা করতে থাকেন যে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী শিঘ্রই সাধু হবেন। সেই প্রত্যাশা প্রাপ্তির দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কেননা আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুর ২৯ বছর পর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর বিশ্বজনীন মণ্ডলী তাঁকে ‘ঈশ্বরের সেবক’ উপাধিতে ভূষিত করেন। উল্লেখ্য ‘ঈশ্বরের সেবক’ উপাধি হলো সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের প্রথম পর্যায়। পর্যায়ক্রমে তিনি পূজনীয় ও ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে সাধুশ্রেণীভুক্ত হবেন তা আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা। আশাপ্রদ দিক হলো যে ইতোমধ্যে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বিষয়ে ধর্মপ্রদেশীয় অনুসন্ধানের কাজ সমাপ্ত করে গত এপ্রিল ২০১৯-এ পোপ মহোদয়ের দপ্তরে সমস্ত রিপোর্ট ও দলিল দস্তাবেজ জমা দেওয়া হয়েছে। গোটা মণ্ডলী এখন গভীর আগ্রহে প্রত্যাশা করছে ঈশ্বরের সেবক পর্যায় থেকে যেন তিনি পরবর্তী ধাপে (পূজনীয়) উন্নীত হতে পারেন। জন্মশতবার্ষিকীর সময়কালে ‘পূজনীয়’ হবার ঘোষণাটি আসলে তা একটি ঐতিহাসিক ঘটনাতে পরিণত হবে।

পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তায় মণ্ডলী নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সাধু ঘোষণার কাজটি করে থাকে। তবে পবিত্র আত্মার সহায়তা যাচ্না করার সাথে সাথে বিশ্বাসী আমাদেরও কিছু কিছু কাজ করতে হবে। যাতে করে এ প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলির জীবনের গুণাবলীর কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। তাই তার জীবনের ওপর বিভিন্ন লেখা ও ডকুমেন্টারী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। তার কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন অলৌকিক সহায়তার কথা জানাতে হবে কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্নজনকে। ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে এইসব অলৌকিক কাজের কথা। সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাতেই ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি সাধু থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী হয়ে ওঠবেন। ✝

মঙ্গলবাণী

“কেননা মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, আর তখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।” (- মথি: ১৬:১৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

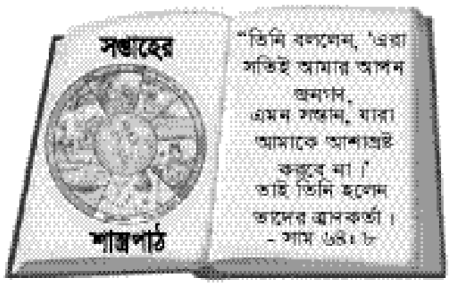

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩০ আগস্ট - ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৩০ আগস্ট, রবিবার

জেরেমিয়া ২০: ৭-৯, সাম ৬৩: ১-৫, ৭-৮, রোমীয় ১২: ১-২, মথি ১৬: ২১-২৭

৩১ আগস্ট, সোমবার

১ করি ২: ১-৫, সাম ১১৯: ৯৭-১০২, লুক ৪: ১৬-৩০

১ মঙ্গল ১৭ ভাদ্র সাধারণকালের ২২শ সপ্তাহ (প্রাহরিক প্রার্থনা-২)

১ করি ২: ১০-১৬, সাম ১৪৫: ৮-১৪, লুক ৪: ৩১-৩৭

২ আগস্ট, বুধবার

১ করি ৩: ১-৯, সাম ৩৩: ১২-১৫, ২০-২১, লুক ৪: ৩৮-৪৪

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলী সিএসসি-এর মৃত্যুবার্ষিকী (+১৯৭৭)

৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরী, পোপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস

১ করি ৩: ১৮-২৩, সাম ২৪: ১-৬, লুক ৫: ১-১১

৪ আগস্ট, শুক্রবার

১ করি ৪: ১-৫, সাম ৩৭: ৩-৬, ২৭-২৮, ৩৯-৪০, লুক ৫: ৩৩-৩৯

৫ আগস্ট, শনিবার

শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ

১ করি ৪: ৬-১৫, সাম ১৪৫: ১৭-২১, লুক ৬: ১-৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩০ আগস্ট, রবিবার

+ ২০০৬ সিস্টার মেরী ডরথী এসএমআরএ (ঢাকা)

৩১ আগস্ট, সোমবার

+ ২০০১ সিস্টার মেরী ফ্লোরেন্স এমসি (ঢাকা)

+ ২২০২ ব্রাদার রেমন্ড জে. কর্ণয়ার সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১ আগস্ট, মঙ্গলবার

+ ১৯২৩ ফাদার জোভান্নি নাভা পিমে (দিনাজপুর)

+ ১৯৭৫ সিস্টার মেরী মিরিয়াম পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

+ ২০০১ সিস্টার এম. এ্যান অফ জিজাস, আরএনডিএম (ঢাকা)

২ আগস্ট, বুধবার

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটনিয়াস গাঙ্গুলী সিএসসি-এর মৃত্যুবার্ষিকী (+১৯৭৭)

+ ১৯৫৯ সিস্টার এম. আইরিন আরএনডিএম (ঢাকা)

+ ২০০৩ সিস্টার সিলভিয়া মাকাডো এসসি (খুলনা)

৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

+ ১৯২৩ ফাদার ফ্র্যাঙ্ক কেহো সিএসসি (ঢাকা)

+ ১৯৩৭ সিস্টার এম. সেলিন অফ জিজাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

৪ আগস্ট, শুক্রবার

+ ১৯০০ সিস্টার এম. আগষ্টিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

৫ আগস্ট, শনিবার

+ ১৯৯৮ ফাদার মার্কো মাত্তিয়াজ্জি এসএক্স (খুলনা)

খ্রিস্টমণ্ডলীতে দীক্ষাস্নান

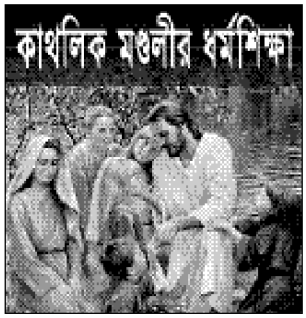

১২৩৬ : ঐশবাণী ঘোষণা প্রার্থীগণকে ও সমবেত সকলকে প্রকাশিত সত্যে আলোকিত করে এবং বিশ্বাসের সাড়া জাগিয়ে দেয় যা দীক্ষাস্নান থেকে অবিচ্ছেদ্য। প্রকৃতপক্ষে, এক নির্দিষ্ট অর্থে, দীক্ষাস্নান হচ্ছে "ধর্মবিশ্বাসের সংস্কার" কেননা এটা হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের জীবন সংস্কারীয় প্রবেশ।

১২৩৭: দীক্ষাস্নান যেহেতু পাপ থেকে এবং পাপের প্ররোচনাকারী শয়তানের হাত থেকে মুক্তি বুঝায়, তাই একবার অথবা একাধিকবার প্রার্থীর ওপর শয়তান-বিতাড়ন-মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। এরপর অনুষ্ঠাতা দীক্ষাপ্রার্থীর তেল দ্বারা তাকে অভিলেপন করেন; অথবা তার উপর হস্ত অর্পণ করেন এবং প্রার্থী স্পষ্টভাবে শয়তানকে পরিত্যাগ করে। এইভাবে প্রস্তুত হয়ে সে খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মবিশ্বাস স্বীকার করতে সক্ষম হয় এবং দীক্ষাস্নানের দ্বারা খ্রিস্টমণ্ডলীর হাতে "ন্যাস্ত" হয়।

১২৩৮: দীক্ষাস্নানের জল (এই সময়ে অথবা পুনরুত্থান নিশি জাগরণীতে) পবিত্র আত্মার আবাহন-প্রার্থনা দ্বারা আশীর্বাদিত করা হয়। খ্রিস্টমণ্ডলী ঈশ্বরকে অনুনয় করে যেন তাঁর পুত্রের মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মার শক্তি এই জলের উপর বর্ষণ করা হয় যাতে এই জল দ্বারা যারা দীক্ষাস্নাত হবে তারা যেন "জল ও আত্মা থেকে জন্ম" নিতে পারে।

১২৩৯: এরপর আসে সংস্কারের মূল অনুষ্ঠান-রীতি দীক্ষাজলে স্নান। দীক্ষাজলে স্নান পাপের দিক থেকে মৃত্যুকে প্রকাশ করে এবং খ্রিস্টের নিস্তার রহস্যের সঙ্গে সদৃশ্যায়নের মাধ্যমে পরম পবিত্র ত্রিত্বের জীবনে প্রবেশ কার্যত বাস্তব করে তোলে। তিনবার দীক্ষাজলে নিমজ্জন করে দীক্ষাস্নান সংস্কার গভীর অর্থসহকারে ও স্পষ্টভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রাচীনকাল থেকে দীক্ষাপ্রার্থীর মাথায় তিনবার জল ঢেলেও দীক্ষাস্নান সম্পাদন হয়ে আসছে।

১২৪০: লাতিন মণ্ডলীতে তিনবার জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের অনুষ্ঠাতা উচ্চারণ করেণ: "(নাম)... আমি তোমাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত করছি।" প্রাচ্য অনুষ্ঠান- পদ্ধতিতে দীক্ষাপ্রার্থী পূর্বদিক ফিরে দাঁড়ায় এবং যাজক বলেন : "ঈশ্বরের সেবক, (নাম)... দীক্ষাস্নাত হচ্ছে: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে।" যাজক পরম পবিত্র ত্রিত্বের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আবাহন করে প্রার্থীকে জলে ডুবান এবং পুনরায় তুলে আনেন।

১২৪১: পবিত্র অভিষেক-তেলের দ্বারা অভিলেপন। বিশপ কর্তৃক আশীর্বাদিত সুগন্ধী তেল নব দীক্ষাস্নাতকে প্রদত্ত পবিত্র আত্মার দানকেই প্রকাশ করে, এই অভিলেপনের দ্বারা সে খ্রিস্টান হয়েছে, সে পবিত্র আত্মা কর্তৃক "অভিষিক্ত" এবং সেই খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত যিনি অভিষিক্ত যাজক, প্রবক্তা, রাজা।

১২৪২: প্রাচীন মণ্ডলী অনুষ্ঠান-রীতিতে দীক্ষাস্নানোত্তর তেল-লেপন হলো অভিষেক-তেললেপন সংস্কার (দৃঢ়ীকরণ)। রোমীয় মণ্ডলীর অনুষ্ঠান রীতিতে দীক্ষাস্নানোত্তর তেললেপন পবিত্র অভিষেক তেল দ্বারা দ্বিতীয় লেপনের প্রতি ইঙ্গিত দেয়, যা পরবর্তীতে বিশপ কর্তৃক সম্পাদিত হবে, আর তা হল দৃঢ়ীকরণ, যা বলতে গেলে, দীক্ষাস্নানের অভিষেককে "দৃঢ়" করবে ও পূর্ণতা দেবে।

১২৪৩: শুভ্র বসন, এই অর্থ বহন করে যে, দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি "খ্রিস্টকে পরিধান করেছে" খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছে। মোমবাতি, পুনরুত্থান মোমবাতি থেকে প্রজ্বলিত এই বাতিটির অর্থ হচ্ছে খ্রিস্ট নবদীক্ষাস্নাতকে আলোকিত করেছেন। খ্রিস্টতে দীক্ষস্নাত ব্যক্তি হল "জগতের আলো"।

নবদীক্ষাস্নাত ব্যক্তি এখন একমাত্র পুত্রে, ঈশ্বরের একজন সন্তান, সে ঈশ্বর-সন্তানগণের অর্থাৎ "আমাদের পিতা" প্রার্থনাটি বলার যোগ্য।

১২৪৪: প্রথম পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ: বিবাহ-পোষাকে সজ্জিত ঈশ্বরের সন্তান হয়ে, নবদীক্ষাস্নাত ব্যক্তি "মেষশাবকের বিবাহ ভোজে" গৃহিত হয়, এবং নবজীবনে খাদ্য খ্রিস্টের দেহ-রক্ত গ্রহণ করে। প্রাচ্য মণ্ডলীগুলো সকল নবদীক্ষাস্নাতদের এবং দৃঢ়ীকরণ সংস্কার- প্রাপ্তদের, এমন কি শিশুদেরও খ্রিস্টপ্রসাদ দান করে, খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশের মধ্যে ঐক্যের এক প্রানবন্ত চেতনা সংরক্ষণ করেছে, এবং প্রভুর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে: "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাঁধা দিও না"। লাতিন মণ্ডলী পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ তাদেরই জন্য গ্রহণ করার বিধান রেখেছে যাদের বুঝবার বয়স হয়েছে; এর মধ্য দিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী, প্রভুর প্রার্থনার জন্য নবদীক্ষাস্নাত শিশুকে বেদীতে এনে, দীক্ষস্নানই যে তাকে খ্রিস্টপ্রসাদের দিকে নিয়ে যায় তা ব্যক্ত করেছে॥

না দেখা সেই মানুষটি

ফাদার শিশির কোড়াইয়া

যুগে-যুগে পৃথিবীতে কিছু কিছু মহামানব, মহাত্মার আগমন ঘটেছে, যাদের ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় অপরিবর্তনীয় দাগ রেখে গেছেন। মানুষের জীবনে ঈশ্বরের উপলব্ধিকে পূর্ণতর করার জন্যই মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মহত্ত্ব, তাঁদের বিশালত্বের বৈদ্যুতিক ঝলক ক্ষণকালের জন্য হলেও মহতী সম্ভাবনার বিদুৎ শিখা মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব সারা জগতের মানুষকে যুগে-যুগে করেছে আত্মান্বেষী ও , প্রার্থনায় বলীয়ান। বাংলাদেশের প্রথম বাঙালি বিশপ ও আর্চবিশপ, হাসনাবাদের কৃতি সন্তান ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী এমনি একজন অমৃতপুরুষ মহর্ষি। তাঁর জীবন-দর্শনও মানবজাতির কল্যাণের জন্য নিবেদিত।

জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝেই মানব জীবনের পাপ-পুণ্যের ইতিহাস রচিত হয়। জীবনের আরম্ভের প্রথম বক্ষস্পন্দন থেকে অন্তিমকালের শেষ নিশ্বাসটি পর্যন্ত জীবনের এই স্বল্প পরিসর পরিধিতেই মানুষ সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টার কাছে নিজের যা দেবার এবং নেবার আছে সে সাধনায় ব্যাপৃত থাকে। এমনি সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে যা সত্য, সেই আধ্যাত্মিক জীবনের পবিত্রতা ও পূর্ণতায় ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ছিলেন উজ্জ্বলতম। জাগতিক জীবনের উর্ধ্বে মানবিক ও আত্মিক জীবনের এই পূজারী প্রতি মুহূর্তেই ত্যাগ, সাধনা ও ধ্যান-প্রার্থনা-আরাধনায় শুধু মানুষের চিরকল্যাণই কামনা করেছেন। পবিত্রতা-পিয়াসী এই সন্ত মানুষটি শুধু পুণ্যের সাধনাই করেছেন আজীবন। প্রভু যিশুর মতই নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, যার ফলে নিজের যেটুকু ছিল তা তৃপ্ত-চিত্তে সন্তানদের কল্যাণে নিবেদন করে গেছেন।

এই মহান ব্যক্তি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। তবে অন্ধকারের মাঝে আলো জ্বালালে সবাই আলো পায় তেমনি এই মহান ব্যক্তির আলোকবর্তিকাময় জীবনও নতুন প্রজন্মের কাছে অনেকটা প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। দেখিনি যাকে, শুনেছি যার জীবন-কাহিনি, পড়েছি তাঁরই সম্পর্কে কতোকথা। সেই না দেখার আক্ষেপকে সাঙ্গ করে যা শুনেছি, যা পড়েছি, বিভিন্ন গুণী মানুষের লেখা-আলাপ-আলোচনার আলোকে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবনালোক থেকে কিছু লেখার প্রয়াস পাচ্ছি।

জীবনবোধের স্রষ্টা নির্ভরশীলতা, ধর্ম-কর্ম, প্রজ্ঞাময়তা, প্রার্থনায় একাগ্রতা, হৃদয়-মনে ধার্মিকতার জীবন্ত সাক্ষ্য আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী। তিনি আমাদের শেখান উৎসর্গীকৃত জীবনের অর্থময় প্রাসঙ্গিকতা। ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর সবচেয়ে শক্তিশালী গুণটি ছিল তাঁর প্রার্থনাশীল ধার্মিক জীবন। একজন মানুষের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার যতো মজবুত হয়, তার জীবনে অন্যান্য

গুণগুলো ততো বিকশিত হয়ে ওঠে, এই বিষয়টি আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর জীবনের মূর্তমান ছিল।

আত্মত্যাগী মহান পুরুষ ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী। যিনি নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন মানবের সেবার তরে। পৃথিবীতে থেকেও তিনি স্বর্গের গুরুত্ব বুঝেই এ অস্থির, অশান্ত-শান্তিহীন পৃথিবীতে মনে করতেন পৃথিবী আরো বেশি অর্থপূর্ণ হতে পারে আনন্দ-শান্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালবাসায় জীবন-যাপনের মাধ্যমে। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে আমাদেরকে শেখান নম্রতা, ত্যাগস্বীকার ও সহনশীলতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। জীবনে ছিল না কোন কিছুর প্রতি আসক্তি। সর্বদা সরল-সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনে ছিল না কোন অর্থের জৌলুস।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী ছিলেন পরম পিতার চরণতলে নিবেদিতপ্রাণ, পরমেশ্বরে পূজার বেদীতলে। তাঁর জীবন ছিল নৈবেদ্যরূপে সমর্পিত মানুষের সেবাব্রতে তিনি ছিলেন পূর্ণসত্ত্বায় উৎসর্গীকৃত। মানুষের প্রতি ভালবাসার মধ্যদিয়ে ন্যায়-ত্যাগের দ্বারা সুসংহত সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তোলার স্পষ্ট আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ছিলেন বাংলার মানুষের প্রাণ পুরুষ। তিনি ত্যাগ ও দরিদ্রতা নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছেন।

মৃত্যুর পূর্বে পরমপূজ্যপাদ আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার বলেছেন, "আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ এত গভীর ছিল যে, ঈশ্বর মানুষের সেবায় তাঁর দেবার মত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না"। ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী তাঁর সবকিছুই অকাতরে বিনামূল্যে বিলিয়ে দিয়ে রিক্ত, নিস্ব হয়েছেন।

খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যারা উচ্চ শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের নামের সাথে প্রয়াত আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর নাম অনায়াসে উল্লেখ করা যায়। মোক্ষ লাভের জন্য ত্রাণদাতা প্রভু যিশু যে পথটি দেখিয়েছেন, সেই অনন্ত মুক্তির পথে ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলী অকপট চিত্তে বিচরণ করেছেন। প্রভু যিশু যেমন বিনম্র সেবক ছিলেন, তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীও তেমনি বিনম্র সেবকরূপে জীবন-যাপন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

মানুষের প্রতি ভালবাসার মধ্যদিয়ে ন্যায়, নম্রতা ও ত্যাগভিত্তিক সুসংহত সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তোলার অমোঘ ও স্পষ্ট আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন ক্ষমতার প্রতাপ আর পরিচালনার দক্ষতার মধ্যদিয়েই শুধু জনগণের মন জয় করা সম্ভব নয়, ভালবাসায় নিস্ব হয়ে গেলেই ভালবাসা পাওয়া যায়। মানুষের হৃদয়ে নিজের যে আসনটি তিনি দখল করে নিয়েছেন সে আসনে তিনি আছেন, থাকবেন চিরকাল। ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী ছিলেন নম্রতার শিরোমণি। "নম্রতা প্রজ্ঞাবানের মাথার মুকুট" এ কথাটার বাস্তবস্বরূপ পাওয়া গেছে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর জীবনে।

ঈশ্বরের সেবক টিএ গাঙ্গুলী, স্বভাবে বিন্দুমাত্র কঠোরতা নেই অথচ মনের দৃঢ়তা বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন মাটির মানুষ। মাটি আঘাত, উৎপীড়ন, সবকিছুই নীরবে সহ্য করেছেন। ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী ছিলেন শান্তির দূত। শান্তিকে তিনি অন্তরের পরম সম্পদরূপে ধরে রাখতেন।

সকল প্রতিকূলতায়, মনের দুর্বিসহ বেদনায় তিনি ক্রুশকে আরও বেশি করেই আঁকড়ে ধরেছেন। "ঈশ্বর আমার সহায়" এই আদর্শ প্রতীক (কোড অব আর্মস) নিয়ে আজীবন ঈশ্বর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি

বলেন, পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদে প্রভু যিশুর বাস্তব উপস্থিতি এবং এই উপস্থিতির আশ্রয়ে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি, ঈশ্বরের মধ্যে মানুষের রূপান্তর, মানুষের মধ্যে একতা ও পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ, যা বর্তমান পৃথিবীতে একান্ত কাম্য। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি সোজা চলে যেতেন গির্জায়। খ্রিস্টযাগের পূর্বে অনেকক্ষণ তিনি পবিত্র আরাধ্য সংস্কারের সম্মুখে জানু পেতে প্রার্থনা করতেন। সন্ধ্যায়ও তাকে দেখা যেতো গির্জাঘরে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। মা মারীয়ার প্রতি ছিলো তাঁর অবিচল আস্থা। তিনি বলতেন, "মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করলে বড় একটা বিফল হতে হয় না"।

দারিদ্র্য ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি ভালবাসাই ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে স্বাধীনতা-যুদ্ধের পর বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে অনেক সাহায্য করেছেন। পরোপকারী আর্চবিশপ কোনদিন অপরের সুখ-সুবিধার চেয়ে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বড় করে দেখেননি। আজীবন তিনি নিজের কষ্ট নিজেই বহন করেছেন।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী একটি নাম, একটি কালজয়ী ইতিহাস, একজন খ্রিস্টে নিবেদিত মহামানব। তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব, বাঙালি জাতিরও গৌরব। তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর আকাশে দিবালোকের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি গরীবের বন্ধু, অসহায়ের আশ্রয় ও সান্ত্বনার উৎস।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী ছিলেন পরম পিতার চরণতলে নিবেদিতপ্রাণ, পরমেশ্বরে পূজার বেদীতলে তাঁর জীবন ছিল নৈবেদ্যরূপে সমর্পিত, মানুষের সেবাব্রতে তিনি ছিলেন পূর্ণসত্ত্বায় উৎসর্গীকৃত। মানুষের প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে ন্যায়-ত্যাগের দ্বারা সুসংহত সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তোলার স্পষ্ট আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ছিলেন বাংলার মানুষের প্রাণ পুরুষ। তিনি ত্যাগ ও দরিদ্রতায় নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছেন। ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর পবিত্র জীবনের আদর্শ আমাদের সবার জন্য আলো হয়ে ওঠুক। তাঁর মতো পবিত্র ও ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার বাসনা অন্তরে আমরাও যেন অনুভব করি॥ ■

মহাপুরুষ

ডেভিড স্বপন রোজারিও

প্রভু যিশুর খ্রিস্টের স্বর্গারোহণের পূর্বে তাঁর শিষ্যদের প্রতি এক মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি বলেন দেখ, স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত কর্তৃত্ব আমার হাতে দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোককে আমার শিষ্য কর, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আর আমি তোমাদের যে সব আজ্ঞা দিয়েছি, আমার এ সব নতুন শিষ্যদের পালন করতে শেখাও, আর নিশ্চয় করে জানো যে, আমি যুগান্ত পর্যন্ত সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি। *(মথি ২৮, ১৮-২০)*

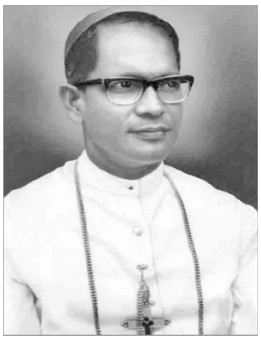

আর সে আদেশে বলিয়ান হয়ে যুগ-যুগ ধরে, কত মহাপুরুষদের পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের কল্যাণের জন্য ও ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁরা কাজ করে গেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিটি বাক্য তাঁদের মুখ দিয়ে বলান। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদ পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর শিষ্য ও পুরোহিতগণ অকুতোভয়ে বাণীপ্রচার করে থাকেন। প্রভুর এ বাণীপ্রচার করতে গিয়ে কত নির্যাতন, অপমান, তাঁদের সহ্য করতে হচ্ছে, এমনকি নির্মম মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা ভয় পাননি, বরং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আজও মানুষের পাপ মুক্তির জন্য বাণীপ্রচার করে যাচ্ছেন। যিশুর আদেশ তাঁরা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করছেন। তাই তো সে সমস্ত সাধু সাধ্বীগণ তাঁদের আত্মত্যাগের মহিমায়, আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে আছেন।

সেই রকম এক ক্ষণজন্মা পুরুষ মহামানব মহাসাধক ছিলেন, আমাদের মহামান্য আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী (সিএসসি) তাঁর সদাহাস্যময় মুখ, বিনয়ী কথাবার্তা, নম্রস্বভাব, অতি সাধারণ বেশ-বাস জীবন-যাপন, সকল খ্রিস্টভক্তদের মাঝে করে তুলে ছিলেন তাঁকে এক জীবন্ত সাধু। তাঁর সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সত্যিই আমি সেই হারিয়ে ফেললাম কোথা থেকে কিভাবে শুরু করব, যেন সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এমন একজন ব্যক্তিত্ব সাধু পুরুষের বিষয় কিছু লিখবো, সে ধৃষ্টতা আমার নেই। তারপরও স্মৃতির অতল সমুদ্রে ডুব দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। সাধারণত আমি ছোট গল্প লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনায় এক একটি চরিত্র চিত্রনে প্রচেষ্টা চালাই। কোন সময় সার্থক হই, পাঠক সমাদৃত হয়, আবার ব্যর্থও হই। মহামান্য আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনেকে হয়তো সুন্দর সুন্দর স্মৃতিচারণ করবো; তাদের মাঝে আমার লোখাটি নগণ্য হলেও যেটুকু স্মৃতির পাতায় সযত্নে রক্ষিত আছে, তাই-ই সুহৃদয় পাঠকের কাছে তুলে ধরার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র।

ছেলেবেলা থেকেই ফাদাররা আমার হৃদয়ের একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। আমার ঠাকুরমা বলতেন, ফাদারদের সাথে সবসময় যিশু থাকেন, তাঁরা যিশুর সাথে কথা বলেন। ফলে ভয়ে কোনদিন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ফাদারদের ধারের কাছে যেতাম না। কারণ আজ অবধি আমার বিশ্বাস তাঁরা যিশুকে বহন করেন, তাঁরা সাথে কথা বলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বলা মহাপাপ। এ জন্য ফাদারগণ আমার কাছে নমস্য ও শ্রদ্ধাভাজন। সত্য কথা বলতে কি, সৎ ও চরিত্রবান হওয়ার গুণাবলি এবং আধ্যাত্মিক পরামর্শ, ফাদারদের কাছ থেকেই পেয়েছি।

আজ বেশ মনে পড়ে আমি তখন রাঙামাটিয়া প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। মহামান্য আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী স্কুলের একটি বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এলেন। সপ্তাহখানেক আগে থেকে চারিদিকে সাজ-সাজ রব পরে গেলো। স্কুলের পার্টিসন সরিয়ে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা হল রুমটা বড় করে ফেললাম এবং ঝেড়ে মুছে সাধ্যমত সাফা করে তুললাম। সিস্টারদের নেতৃত্বে একদল ছাত্র-ছাত্রী গানের ও নাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। অনুষ্ঠানের দিন গাঁদা ফুলের মালা ও থালাভর্তি লাল গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে প্রধান অতিথিকে বরণ করা হলো। একদল মেয়ে হেলে-দুলে গাইলো-

আমি বন ফুল গো,
ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে
আমি বনফুল গো।

সেদিনের সেই আনন্দঘন পরিবেশে প্রধান অতিথিরা বলেছিলেন- তার সবটুকু আজ আর মনে নেই কবে কয়েকটি উপদেশ আজও হৃদয়ে গেঁথে আছে তাহলে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার এক আজ্ঞা পিতা-মাতাকে সম্মান করে চলবে। গুরুজনদের শ্রদ্ধা ভক্তি করবে। নিয়মিত পড়াশুনা করবে। সদা সত্য কথা বলবে, তবেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে।

বেশ অনেকদিন পর, সেই একই ধরনের উপদেশ তাঁর বিনয়ী কণ্ঠে ও নম্র এবং সরল ভাষায় শুনছিলাম। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভাওয়াল খ্রিস্টান যুব সমিতি এক যুব সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মাঝে তিনি উপস্থিত যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে নৈতিকতাবোধ, মানবিকতা, নিস্বার্থ সমাজসেবা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, সৎ চরিত্রবান ও উচ্চশিক্ষা লাভের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, যে অভাবনীয় বক্তব্য রাখেন, তা আজও হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তিনি অত্যন্ত

ধীর-স্থির এক অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। শব্দ চয়ন ও শব্দ প্রয়োগে, তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কারো সমালোচনা সরাসরি না করে, অল্প কথায় মূল্যবান উপদেশ দিতেন। তিনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন তাঁর মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল স্বর্গীয় আভা ফুটে ওঠেছিল। বক্তব্য শেষে হাততালি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। চারিদিকে তাঁর বক্তব্যের বেশ অনেকক্ষণ আলোড়িত হচ্ছিলো। তাঁর উপদেশের সারসংক্ষেপ জীবনের আদর্শ মেনে নিয়েছিলাম। যার জন্যে আজও যদি কেউ প্রশ্ন করে- আপনার জীবনের উন্নতির মূল চাবিকাঠি কি? আমি স্বগর্বে বলি, তিনটি বাণী আমার চলার পথে পাথেয়-

- বয়োজ্যেষ্ঠদের ভক্তি শ্রদ্ধা করা
- সময়নিষ্ঠা
- সততা

আমার জীবনে যা কিছু অর্জন তা পুরোহিত ও গুরুজনদের উপদেশ ও প্রেরণার জন্য। অবশ্য দুমুখোরা অনেক সময় বলে থাকে এ দেশে ফাদাররা আমাদের জন্য কি করছেন? যারা এদেশে খ্রিস্টানদের গোড়াপত্তনের দিকে তাকাই তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিদেশী মিশনারী ফাদারগণ আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, ধর্মীয় ও আর্থিক উন্নয়নে কত মহান-মহান সব অবদান রেখে গেছেন এবং আজও করে যাচ্ছেন। আজকের যুগে সে সমস্ত ইতিহাস আমাদের কম-বেশি সবারই জানা। কিনা করেছেন? আত্মীক ক্ষুধা নিবারণের জন্য উপাসনালয়, বিদ্যার্জনের জন্য পাঠশালা, স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেছেন। ধীরে-ধীরে ধর্মপল্লীর উন্নয়নের জন্য গঠন করেছেন যুব সমিতি, মহিলা সমিতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্র সংগঠন। এভাবেই খ্রিস্টভক্তদের জন্য সেনা সংঘ, ভিনসেন্ট ডি পল, নানা সেবামূলক সংগঠন, প্রায় প্রতিটি প্যারিস গড়ে ওঠেছে। সর্বশেষ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে, সমগ্র খ্রিস্টান সমাজকে যে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিয়েছেন, তা যুগ-যুগ ধরে গোটা খ্রিস্টান সমাজ গর্বের সাথে স্মরণ করবে।

স্বর্গীয় আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ছিলেন মানবদরদী, দায়িত্ববান, নীতিতে অটল, কর্তব্যপরায়ণ এক মহান পুরুষ। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী নম্র ও আমায়িক। তাঁর ব্যবহার মানুষকে করত মুগ্ধ। তাই তিনি সকল খ্রিস্টভক্তদের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর অকাল মহাপ্রয়াণের গোটা খ্রিস্টান সমাজের অনেক অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে যা পূরণ আর হবে না। প্রথম বাঙালি বিশপ ও পরে আর্চবিশপ আমাদের গর্ব ও পূজনীয়। এ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, প্রভু যিশু খ্রিস্টের আদেশ, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় অনেকে পুরোহিত জীবনে আহ্বান পেয়ে, প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। এমনকি অনেক সিস্টারগণ তাঁর কাছে অনুপ্রেরণা পেয়ে, ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করেছেন।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ২ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৭ বছর। বাংলাদেশের রেডিও, টিভিতে এবং সকল সংবাদপত্রে মহান সাধুর মহাপ্রয়াণের স্বচিত্র সংবাদ, ফলাও করে ছাপানো ও প্রচার করা হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বর্গীয় মহামান্য আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী, যেমন ছিলেন প্রথম বাঙালি বিশপ পরে আর্চবিশপ, তেমনি হবেন প্রথম বাঙালি সাধু। আশা করি অচিরেই তিনি ধন্যশ্রেণীভুক্ত হবেন এবং স্বর্গ থেকে আমাদের প্রচুর আশীর্বাদ করবেন- সে আশায় বুক বেঁধে আছি॥ ■

এসএমআরএ সংঘের সন্ন্যাসব্রতিনী ভগিনী সিস্টার মেরী অর্পিতা'র অনন্তধামে যাত্রা

সিস্টার মেরী অর্পিতা রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর বড় সাতানীপাড়া গ্রামে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল তার পিতামাতার ঘর আলো করে এই পৃথিবীতে আসেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পাশ করে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই তিনি এসএমআরএ সংঘে প্রবেশ করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারী প্রথম ব্রত এবং ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারী আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে মিডওয়াইফ্যারী নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে মহাখালি নার্সিং কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করেন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন থেকে Advanced Diploma & MSC in Healthcare প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে London St. Anselm Institute থেকে Human Growth এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন স্থানে সিস্টার অর্পিতার সেবাকর্ম : ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালের মেট্রন এবং পরে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস ডিসপেনসারী, পানজোরা সেন্ট আন্তনীর ডিসপেনসারী পরিচালিকার দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৭-২০১৩ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালের নার্সিং স্কুল এবং কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেন্ট মেরীস মা ও শিশু সেবাকেন্দ্রের পরিচালিকার দায়িত্ব পালন করেন। অতপর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে মেরী হাউজের এবং ২০১৬-২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পানজোরা আশ্রমের আশ্রম পরিচালিকার এবং ডিসপেনসারীতে নার্সিং সেবার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৮-২০২০ খ্রিস্টাব্দে বনপাড়া আশ্রমের পরিচালিকা এবং ডিসপেনসারীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। সিস্টার অর্পিতা তার এই সেবাদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরপর তিনবার আমাদের সংঘের মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য যে, তার বড় দুই বোন সিস্টার মেরী প্রীতি এবং সিস্টার মেরী ছবি এই এসএমআরএ ধর্মসংঘের সন্ন্যাসব্রতী।

সিস্টারের ব্যক্তিময় জীবন : সিস্টার অর্পিতা আমাদের এসএমআরএ পরিবারে একজন দক্ষ সেবিকা হিসেবে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। কুমুদিনী নার্সিং স্কুল এণ্ড কলেজে প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি দুই দুইবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দশটি বৎসর সেখানে নার্সিং প্রশিক্ষণরত ছাত্রীদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যত্ন দান করেন। ছাত্রী এবং সেবিকাদের সিস্টার অনেক ভালবাসতেন। হাসপাতালের রোগীরা যেন উত্তম সেবা পায় সেদিকেও সর্বদা সচেতন দৃষ্টি রাখতেন। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষদের সাথে সিস্টারের খুব আন্তরিক একটা সম্পর্ক ছিল। সিস্টারকে তারা খুব শ্রদ্ধা করতেন, বিশ্বাস করতেন এবং ভালবাসতেন। সিস্টার অর্পিতা বিভিন্ন ডিসনেন্সারীতে অত্যন্ত দক্ষতা ও পরিণামদর্শিতার সাথে আন্তরিক সেবাদান করার পাশাপাশি তিনি আশ্রম কর্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। একই সাথে তিনি সংঘের মন্ত্রণা পরিষদেও দীর্ঘ আটটি বছর নার্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে যথেষ্ট অবদান রাখেন। সংঘের সেবিকা ভগ্নিদের সমস্যায় পরামর্শ দান, সেবার গুণগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, উচ্চশিক্ষা লাভ, শিক্ষা সফর, দরিদ্র রোগীদের সেবার জন্য ফাণ্ড তৈরী, ডিসপেন্সারীগুলোর কাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি বহু বিষয়ে সিস্টার অসামান্য অবদান রাখেন।

এছাড়াও সিস্টার অর্পিতা অনেক আধ্যাত্মিক ও মানবীয় গুণাবলীর অধিকারিণী ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ়মনা ও পরিণামদর্শী। তিনি যা ভাল বলে চিন্তা করতেন তা কাজে পরিণত করতেন। আশ্রমের ভগ্নিদের প্রতি তিনি খুব সর্বজনীন ছিলেন। রোগীদের সাথে, পালকীয় কাজে জনগণের সাথে সিস্টারের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভয় পেতেন না। অনেক সময় বাইরে থেকে কঠিন মনে হলেও তিনি ছিলেন কোমলপ্রাণ। সংঘকে ভালবেসে, নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত ও প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান থেকে তিনি সংঘকে সমৃদ্ধশালী করেছেন।

অসুস্থতা ও মৃত্যু : বিগত এক সপ্তাহ আগে সিস্টার অর্পিতা ঠাণ্ডা, কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হন। গত ১৭ আগস্ট সোমবার রাতে সিস্টার মেরী হাউজে আসেন। ঢাকায় আসার সাথে সাথেই তার সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে ডেঙ্গু, নিউমোনিয়া এবং কোভিড ১৯ ধরা পড়ে। সিস্টারকে প্রথমে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি দেখে শুক্রবার সকালে তাকে সমরিতা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ICU-তে ভর্তি করা হয়। ২২ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মধ্যরাত্রি সময় ১:০০ ঘটিকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বিজ্ঞ/১৩৮/২০

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর একান্ত সান্নিধ্যে : স্মৃতিকথা

সিস্টার মেরী দীপিকা এসএমআরএ

ওগো মহাপ্রাণ তোমারে প্রণাম করি
পুণ্যত্যাগের পুষ্পাঞ্জলি ছড়ালে বিশ্ব ভরি।

যাদেরকে গভীরভাবে ভালবাসি; আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি তাদের কিছু কিছু কথা, কাজ, আচরণ, সর্বদাই মানসপটে গাথা থাকে জীবনে চলার পথে প্রেরণা দেয়। বাংলাদেশ মণ্ডলীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি ছিলেন শান্তির মঙ্গলবার্তার প্রচারক। ঐ বেদনাবিধুর স্মরণীয় মুহূর্তগুলোতে উনার সম্পৃক্ততা আমার এ লেখায় অত্যন্ত সাদামাঠাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

যেখানে সত্যিকার শান্তি সান্ত্বনা মিলে: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ আমার জীবনে স্মৃতিঘেরা স্মরণীয় বছর। স্বাধীনতা সংগ্রামে দু'মাসের ব্যবধানে শ্রদ্ধাষ্পদ প্রাণপ্রিয় বাবা-মাকে হারাই। অসুস্থ বাবা (৫৭) ২৪ জুন দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব পর্ব দিনে সন্ধ্যায় মারা যান। এক মাস পর ২৫ জুলাই রোজ রবিবার ঢাকাগামী ট্রেন সকালে নলছাটায় মুক্তি বাহিনীর মাইন বিস্ফোরণের ফলে বিকট শব্দ করে লাইনচ্যুত হয়। আমাদের সিস্টার করমারী (প্রায়ত) এবং সিস্টার সাধনাও সেই ট্রেনে ছিলেন। তাদের বগি গড়িয়ে খাদে পড়েছে, কিন্তু তারা ঐ যাত্রায় ঈশ্বরের দয়ায় বেঁচে গেছেন। ঐ দিন দুপুরে ঢাকা থেকে পাকবাহিনীর আগমন ঘটে আমাদের ভাওয়াল এলাকায়। মানুষ প্রাণভয়ে আতঙ্কে জীবন-যাপন করতো। আগস্ট মাস- চারিদিকে ভরা বর্ষা, দড়িপাড়া রেল ব্রীজের দু'পাশে দু' বাহিনীর ক্যাম্প। মুক্তি বাহিনী ও পাক বাহিনী। এক সপ্তাহ আগে পাকবাহিনী গ্রামবাসীকে গ্রাম ত্যাগ করার আদেশ জারি করেন। ২৯ আগস্টের পর তারা গ্রাম পুড়িয়ে দিবে তাও জারী করে।

২৮ আগস্ট দুই বাহিনীর গোলাগুলির বিকট শব্দে রাত ৯টায় প্রার্থনারত স্নেহময়ী মা (৫০ বছর) হার্ট ফেইল করেন। ঐ মুহূর্তেই গ্রামবাসী জীবন মরণ বাজি রেখে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছেন। আমার মাও গ্রাম ছেড়েছেন তবে প্রাণহীন অবস্থায় ষোল আনাই অনাথের দলভুক্ত হয়ে গেলাম।

মায়ের এই অপ্রত্যাশিত অকাল মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত হয়েছি। আমার বয়স তখন মাত্র ২৪ বছর, ৪ (চার) বছরের একজন নতুন সিস্টার। হলিক্রস কলেজে ইংলিশ মিডিয়ামে সাইন্স গ্রুপের ছাত্রী। যুদ্ধের কারণে কলেজ বন্ধ থাকায় তুমিলিয়াতেই ছিলাম তখন। রাঙামাটিয়া থেকে লরাস বহু কষ্টে তুমিলিয়া মিশনে আনার ব্যাপারে পাল পুরোহিত ফাদার ন্যাপ সিএসসি এর অনেক অবদান ছিল। দিনটি ছিল রবিবার ২৯ আগস্ট (দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের শিরচ্ছেদ মহাপর্ব) খ্রিস্টযাগের পর বাবার পাশেই মায়ের কবর হয়। তাদের মধ্যে এত গভীর ভালবাসা ছিল যে মৃত্যুও তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, ২৫ জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত দড়িপাড়ায় পাক বাহিনীর গুলি খেয়ে যারা মরেছে- তাদেরকে বাড়িতে বা কচুরীপানার তলেই ঢুকানো হয়েছে আর সেই সুবাদেই মা-বাবার বিশেষভাবে মার মৃত্যুটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। সিস্টারগণও খুবই আহত হয়েছেন, তাদের অনেক সহানুভূতি পেয়েছি। কিন্তু যার ঘা ব্যাথা তো তারাই। আসলেই প্রত্যেকেরই নিজের নিজের বোঝা থাকে; যা তাকে নিজেই বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। এমনই মুহূর্তে ২ সেপ্টেম্বর সিস্টার মেরী তেরেজা (হাউজ সুপিরিয়র) একটি ছোট খাম হাতে দিলেন। প্রভুর (আর্চবিশপ

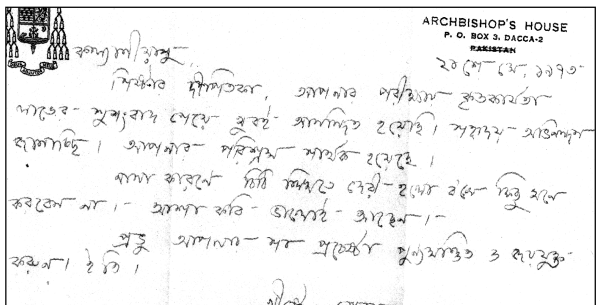
ARCHBISHOP'S HOUSE
P. O. BOX 3, DACCA-2
PAKISTAN

গাঙ্গুলীর) নিজ হাতে লেখা চিঠি (যা কবিতার মত মুখস্থ)

১ সেপ্টেম্বরে লিখেছেন-

স্নেহের সিস্টার দীপিকা

সবেমাত্র গতকাল সিস্টার তেরেজার চিঠিতে আপনার স্নেহময়ী মায়ের অকাল মৃত্যু সংবাদ এবং একই চিঠিতে আপনার বাবার চিরবিদায়ের কথাও জানতে পারলাম। এতে আপনি যে কতটা মর্মাহত হয়েছেন তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। এমন আঘাতে মানুষের কোন সান্ত্বনা বাক্যে মন প্রবোধ মানে না। জানি যে, খ্রিস্টবিশ্বাসে বলিয়সী আপনি-তাই যেখানে সত্যিকার শান্তি ও সান্ত্বনা মিলে, সেখানেই তা খুঁজবেন। অর্থাৎ যিশুর পবিত্র হৃদয়ে ও মা মারীয়ার নির্মল হৃদয়ে। তাঁরাই আপনাকে তাঁদের সান্ত্বনাদানে আশ্বস্ত করবেন। কালই আপনার বাবা-মার আত্মার কল্যাণে ও শোকাহত পরিবারের সকলের জন্যে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবো। ভেঙে পড়বেন না, সাহস রাখুন। আপনার শুভ কামনায়-

খ্রিস্টের সেবক,
টিএ গাঙ্গুলী সিএসসি

সত্যিই প্রভুর লেখা এই চিঠি পড়ে হৃদয় মনে অনেক প্রশান্তি অনুভব করেছিলাম। মনে পড়ে বাইবেলের সেই কথা- প্রজ্ঞা মানুষের উক্তি অন্তরের ক্ষত নিরাময় করে *(প্রবচন ১২:১৮)*। চিন্তাই করতে পারিনি এত বড় মাপের একজন মানুষ আমার মত এত ছোট সিস্টারকে চিঠির মাধ্যমে সান্ত্বনা দিবেন। যিশুর পবিত্র হৃদয় ও মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের প্রতি ভক্তি তখন থেকে আরও সুদৃঢ় হয়েছে। যিশু হৃদয়ের স্তব, আত্মোৎসর্গ, মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের নিকট আত্মোৎসর্গ প্রার্থনাই আমার নিত্যদিনের আত্মিক খাদ্য। বিশেষভাবে বিনম্র হৃদয়, কোমল প্রাণ, প্রভু যিশুর সেই আমন্ত্রণ-কতই না মধুর ও আশ্বাসপূর্ণ- "তোমরা শ্রান্ত যারা বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো: আমি তোমাদের আরাম দেব।" *(মথি ১১:২৮)*।

বুকে মাথা রেখে: পাক-সরকারের চাপে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমাদের কলেজ খুলে গেল। রেললাইন বন্ধ বন্যার কারণে তাই তুমিলিয়া থেকে নৌকাযোগে সিস্টার রুথ (প্রয়াত) ও সিস্টার যোসেফ (প্রয়াত) এর সাথে ঢাকা আসি। পুরাতন মেরী হাউজের (ঘেষবাড়ী) দক্ষিণের বারান্দায় প্রভু ও মাদার আগ্নেস কথা বলছিলেন। আমাদের দেখে দুজন ওঠে দাঁড়ালেন। বুকফাঁটা কান্নায় ভেঙে পড়ি। পিতৃতুল্য প্রভু তাঁর স্নেহালিঙ্গনে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উনার বুকে মাথা রেখে খুব কেঁদেছি। শেষে প্রভু শুধু একটি কথাই বললেন- ভয় নেই আপনার পাশে আছি। মনে হয়েছিল যিশুর বুকে মাথা রেখেই যেন আমি কেঁদেছি। হৃদয়ে অনুভব করেছি উনার অকৃত্রিম পিতৃস্নেহ, সমবেদনা ও অনুকম্পা সত্যি আধ্যাত্মিক পিতার সাথে কন্যার এই পরম মুহূর্তগুলোর স্মৃতি অম্লান হয়ে রয়েছে।

আপনাদের নিরাপত্তার জন্য: দিনে-দিনে যুদ্ধের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। হলিক্রসের চারতলা হোস্টেল থেকে আমাদের নীচের তলায় আনা হয়। পড়াশুনার চাপ বোনদের জন্য দেশের জন্য দুশ্চিন্তার চাপ সব মিলিয়ে যেন মহাচাপের মুখেই ছিলাম। ৩ ডিসেম্বর ভোর ৩টা থেকে মিত্র বাহিনী (ভারতীয় সেনা) ও পাকবাহিনীর মধ্যে তুমুল আকাশ যুদ্ধ শুরু হয়। তেজগাঁও এয়ারপোর্ট এলাকায় গোলাগুলি ও বোম্বিং এর প্রচণ্ড শব্দে দরজা জানলার কাঁচ ভেঙে

চুরমার হয়ে ছিটকে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে কিভাবে যে খাটের তলায় গিয়েছে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। প্রায় দুপুর পর্যন্ত এই তাণ্ডবলীলা চলে। তখন ভয়ের জ্বালায় ক্ষুধার জ্বালায় পালিয়েছে মাতৃতুল্য মাসীমা (সিস্টার প্রজ্ঞার মা) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাত রান্না করছে, ধনে পাতার ভর্তা বানিয়েছে। এসে বলল, "মায়েরা বার হও, একটু ভাত খেয়ে নাও সবাই।" কয়েক গ্রাস খাওয়ার আবার প্রকট শব্দ। বিকেলে কার্ফিউ তুলে নেওয়ার বিরতিতে প্রভু বিশপ, ফাদার বেনাস ও ফাদার পিশাতো গির্জা, বটমলী হোম (হলিক্রস সিস্টারস্ হাউস) মেরী হাউজ, হলিক্রস হাউজ ফ্লাইয়িং ভিজিট করে আমাদের কাছে এলেন। মাদার আগ্নেস; সিস্টার বেনিগ্নাও মেরী হাউজ থেকে এলেন। সবাই খুবই চিন্তিত-উদ্বিগ্ন। প্রভু বললেন, আপনাদের নিরাপত্তার জন্য এখনই লক্ষ্মীবাজার সিস্টারদের কনভেন্টে যেতে হবে। পরিস্থিতি খুবই খারাপ। "উনি আমাদের আশীর্বাদ দিলেন। মাইক্রোতে দুই ট্রিপ নেওয়া হলো। তেজগাঁও এলাকা খালি করে ভিতসন্ত্রস্ত মানুষ ধেয়ে ছুটছে পুরান ঢাকার দিকে। আমরা সিস্টারস্ কনভেন্টের নীচে একটা রুমে ছিলাম। অন্যান্য শরণার্থীদের সঙ্গে আমরাও খিচুরী ভাত খেয়ে দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত করেছি। রোজারিমালা আমাদের একমাত্র সঙ্গী ছিল। পুরান ঢাকার মশারা রক্তচোষার মত শরণার্থীদের রক্তে পুষ্ট হয়েছে।

শেষ আশীর্বাদ : ১১ ডিসেম্বর বিকেলে প্রভু, ফাদার পল গমেজ, এডভোকেট পিটার পল ও নিকু মাস্টার (শুলপুরের) এলেন। প্রভু বললেন, "আগামীকাল আপনারা উনাদের সাথে হেঁটে শুলপুর যাবেন। আমাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, মণ্ডলীতে সমাজে যথেষ্ট সেবা দিয়েছি, আমরা মরে গেলেও আফসোস্ নেই। কিন্তু আপনাদের বেঁচে থাকতে হবে। আর পাক সেনাদের দৃষ্টি যুবকদের ওপর বেশি তাই প্রভু তাঁর পিতৃসুলভ ভালবাসায় শেষ আশীর্বাদ দিয়ে শুভ কামনা করলেন। পিতৃদেবের সাথে এই অন্তরঙ্গ বেদনাদায়ক মুহূর্ত আজও ভুলিনি। মুক্তিযুদ্ধ প্রভুর একান্ত সান্নিধ্য উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছে। পিতার শেষ মঙ্গলাশিষ মাথায় নিয়ে ১২ ডিসেম্বর ভোর ৫টায় বুড়িগঙ্গা পার হয়ে আমরা (সিস্টারস্ সুপ্রিয়া, আনন্দ, সাধনা, শান্তা, জ্যোতির্ময়ী; দীপিকা) হাঁটা পথে রওনা হলাম শুলপুরের উদ্দেশে। আমাদের পথ প্রদর্শকদ্বয় অতি বিশ্বস্তভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন সারাদিন। তারা এখন স্বর্গবাসী। তাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। সেই ঐতিহাসিক হাঁটার কথা মনে হলে এখনও যেন ক্লান্তি অনুভব করি। লাখো বাঙালির হাঁটার প্রতিযোগিতা দেখেছি সেদিন। দিনশেষে শুলপুরের নাগাল গেলাম। সিস্টার আনন্দের ভাই অনিল কস্তা মুক্তিফৌজ ছিল। সে-ও পাক ফৌজের গুলি খেয়ে মারা যায়। সিস্টার আনন্দ ও আমার মন-মানসিকতা সর্বদাই বেদনাতুর ছিল।

১৪ ডিসেম্বর রেডিও অন করতেই শুনি গোটা দেশের বহু বুদ্ধিজীবিকে পাকসেনারা একযোগে হত্যা করেছে। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীও এ তালিকায় ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অপার দয়ায় সেই যাত্রায় তিনি রক্ষা পান। এত ভয়-ভীতি আতঙ্ক, উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তায় মানুষ দিন কাটিয়েছে। তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। দেশপ্রেমিক মানুষের অবিরাম প্রার্থনা ও কান্না ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহর দরবারে দ্বার খুলে দিল। উপরওয়ালার অসীম অনুগ্রহে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও লাখো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি জাতি ১৬ ডিসেম্বর কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সহৃদয় অভিনন্দন জানাচ্ছি: ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আমরা condensed syllabus এর উপর অনেক দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে পরীক্ষা লিখেছি। বর্বর হানাদার পাকিস্তানি সরকার ইয়াহিয়া খানের আমলে পড়াশুনা শুরু করে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শিশু বাংলাদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে এসে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা তো চারটিখানি কথা নয়। তাই আবারও পিতার অভিনন্দন বাণী পাই যা নিম্নরূপ:

তিনি আবার আমাদের তাঁর আধ্যাত্মিক আর্শীবাদে ধন্য করেছেন। *(এফে; ১:৩)*

ত্রি-ফলার পানি খাবেন: ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জুনের শেষে মাতৃগৃহ তুমিলিয়া থেকে প্রথমবারের মত বদলি হয়ে আমি আওয়ার লেডী ফাতেমা কনভেন্ট (কুমিল্লা) যাই। মাতৃগৃহে অনেক সিস্টারের অনাগোনা, প্লাস হোস্টেল মেয়েদের দেখাশুনা একটা অন্যরকম আমেজ, আনন্দ সিস্টার হবার পর বিগত ১০ বছরে বদলীর স্বাদ পাইনি বা অভিজ্ঞতা করিনি। কুমিল্লা এমন একটি মিশন যেখানে হাতে গোনা মাত্র ১৫-২০ জন খ্রিস্টভক্ত। ৬ মাস কোনভাবেই মন বসাতে পারিনি। মাদার আগ্নেসকে চিঠি লিখলাম- "মাদার কুমিল্লাতে আমার মন বসে না। লেডী ফামেতা স্কুলের মাথা ছুলা/ন্যাড়া (ঘাসবিহীন) বালিযুক্ত মাঠের দিকে তাঁকালে আত্মার পানি শুকিয়ে যায় আর দু'চোখে বন্যার ঢল নামে।" মাদার ফিরতি চিঠি লিখেন- সিস্টার দীপিকা মনটা আর কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে? মনটাকে জোর করে বসাতে হবেই।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালের মাঝামাঝি সময়ে প্রভু বিশপ কুমিল্লাতে আসেন। নৈশ প্রীতিভোজের ফাঁকে ফাঁকে স্বভাবসুলভ মৃদুস্বরে ৪জন সিস্টারের (সিস্টার পেট্রা, সিস্টার আইরিন, সিস্টার সান্ত্বনা, সিস্টার দীপিকা) কুশলাদি জেনে নেন। উনার পাশেই আমি বসেছি। আমাকে লক্ষ্য করে "সিস্টার দীপিকা, আপনি কেমন আছেন? কেমন লাগে কুমিল্লায়? "এখনও মন বসে না প্রভু" বললাম। "চিন্তা করবেন না মন বসে যাবে; আমি প্রার্থনা করবো আপনার জন্য" -বললেন। খেতে খেতে উনি বোধহয় আমাকে স্টাডি করছিলেন। এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করেন- "শরীর এত খারাপ কেন ঠিকমত খান না? কোন সমস্যা আছে? পেটের সমস্যার কথা জানালাম। উনি ছোট্ট করে বললেন "বাসী পেটে ত্রি-ফলার পানি খাবেন, খুবই উপকারী।" ত্রি-ফলা শব্দটা কি জিনিস প্রভু? জানতে চাইলাম। "আমলকি, হরিতকী, বয়রাগুটা- এই তিনটিকে একত্রে ত্রি-ফলা বলে।" কোথায় পাবো ত্রি-ফলা?" শুধালাম। "আমি ঢাকায় গিয়ে ফাদার কেনার্কের কাছে-কাছে পাঠিয়ে দিব" বললেন।

পরের সপ্তাহে ঠিকই ফাদারের মাধ্যমে ত্রি-ফলা পেয়ে গেলাম। পিতার নির্দেশ মত খেলাম, ফলও পেলাম। কত গভীর ভালবাসা থাকলে এমনটি হতে পারে। আমি উপলব্ধি করেছি যে, আমার বাবা-মার মৃত্যুতে উনি বেশ মর্মাহত হয়েছেন। তাই আমার জন্য একটা Soft Corner সর্বদাই ছিল।

এই স্নেহশীল পিতা ঐ বছরই (১৯৭৭) ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ মণ্ডলীকে কাঁদিয়ে অকস্মাৎ-ই না ফেরার দেশে চলে যান। বটবৃক্ষের ছায়া যেন সূর্যাস্তের সাথে বিলীন হয়ে গেলেও তাঁর অবদান মণ্ডলী সর্বদা স্মরণ করবে। উনি এখন সাধু হওয়ার প্রথম স্তরে (ঈশ্বরের সেবক) আছেন। স্বর্গীয় পিতার কাছে আমাদের মিনতি-আমরা যেন অচিরেই এই বলে প্রার্থনা করতে পারি-

"সাধু আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী-
আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর॥ ▣

ঈশ্বরের সেবক

শৈলেন পিটার পালমা

ন্যায়ের আদর্শে মহান তুমি,
হে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ
থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী
আমরা তোমাকে নমি।
ছোটবেলায় প্রতিদিন সকালে
অংশ নিতে খ্রিস্টযাগে
ঈশ্বরের সাথে একত্রিত হতে
খ্রিস্টযাগে সেবক হয়ে।
প্রার্থনা আর খ্রিস্টীয় অনুষ্ঠানে,
ঈশ্বরের বাক্য করতে প্রচার।
কথাবার্তা আর ভক্তি বিশ্বাসে,
ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে,
হলে ধর্মযাজক।
বাংলাদেশের তুমিই প্রথম
বাঙালি আর্চবিশপ।
সবাইকে ভালোবেসে আপন করে নিতে
খ্রিস্টযাগে উপদেশে সবার মন জুড়াতে।
ভালবেসে সবাই তোমায়,
ভালোবাসে আজো।
সবার হৃদয়ে আছো তুমি
সর্বদা সব সময়।
পিতার আদর্শে ঘোষিত হলে,
ঈশ্বরের সেবক
কবে তেমায় ডাকবো বলে
বাংলাদেশের প্রথম সাধু
আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী।

বিশ্বনন্দিত মাদার তেরেজা

তার্সিসিউস গোমেজ

"হতদরিদ্র-অবহেলিত অনাথ এতিমজনা
স্নেহময়ী করুণাময়ী শান্তির দূত-জগৎ জননী
কোমলমতি ধার্মিকতা-সহমর্মিতার বিনম্র মা
নিস্ব-রিক্ত সর্বহারা অভুক্তজনের শেষ ঠিকানা।
মানব সেবার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যিনি
আশ্রয় কামনায় খালি হাতে কেউ ফিরেনি
মমতার আধার কোলে তোলে বুকে জড়ান
অসহায় পথ শিশু বিশ্বমাতা তেরেজা তিনি।"

মানব সেবায় মাদার তেরেজার অপরিসীম ধৈর্য, ত্যাগস্বীকার, কঠোর পরিশ্রম, নিস্বার্থপরতা ও দরদী ভালবাসা দেখে বিশ্ববাসী তাঁকে "জীবন্ত সাধ্বী" উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। জীবনের দৃষ্টান্ত সমুজ্জল রাখতে বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলী মাদারের মৃত্যুর মাত্র ১৯ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তাঁকে কোলকাতার সাধ্বী বলে ঘোষণা দেন। মাদার তেরেজা তাঁর বাণী চিরন্তনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন- যদি তুমি মানুষকে বিচার করতে যাও, তা হলে ভালবাসার সময় পাবে না। আবার বলেছেন "ছোট বিষয়ে বিশ্বস্ত হও, কারণ এর উপরই তোমার শক্তি নির্ভর করে।" নিজের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন- "আমি ঈশ্বরের হাতের একটি ছোট পেন্সিল, যা দ্বারা ঈশ্বর পৃথিবীতে ভালবাসার চিঠি লিখেছেন।" অসহায় মানুষদের ভালবেসে মাদার তেরেজা মানুষের মাঝে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন এটি চির সত্য ও বাস্তব। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম, দুঃখী, অসহায়, অবহেলিত, বঞ্চিতদের সেবা করার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে, এ কথা সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার। মানব সেবার উত্তম দৃষ্টান্তকারী যদি কেউ থাকে, তিনি হচ্ছেন মাদার তেরেজা। মনের অদম্য বাসনা, ত্যাগ, ভালবাসা সাহসী ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যিনি ১৯৩১ থেকে মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর ৬৫ বৎসর মানবসেবায় অতিবাহিত করেছেন। স্নেহময়ী মা যেমন সকল সন্তানদের নিজের আত্মত্যাগ, বলা যায় রক্ত দিয়ে স্নেহ-ভালবাসায় আগলে রাখেন মাদার তেরেজাও এমনটিই নিদর্শন হিসেবে সকলের কাছে স্বীকৃতি ও মহীয়সী নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একজন মানুষের কত ধরনের সেবা প্রয়োজন তার একটিও তিনি বাদ রাখেননি। সেবার বাস্তবতার নিরীখে কয়েকটি উদাহরণ হলো

১। অনাথ ও পরিত্যাক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে ভালবাসা প্রদান।

২। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ ব্যক্তি যারা পরিবারের সন্তানদের কাছে বোঝা অথবা সেবা থেকে বঞ্চিত, তাদের সেবা যত্ন করে হয় সুস্থ করে তোলা, না হয় সেবার মাধ্যমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা।

৩। কুষ্ঠরোগীদের সেবা যেমন স্বয়ং ঈশ্বর ও যিশুকে সেবার তুল্য। ঘৃণা, ভয়, সংকোচ যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু মাদার তেরেজা লাজার ও দশজন কুষ্ঠরোগীদের কথা স্মরণ করেই বোধহয় তাদের সেবায় হৃদয়-মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করে আনন্দ পেতেন।

৪। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বলতে কোন অসাম্যতা মাদার তেরেজা না রেখে অভাবী, দরিদ্রদের পক্ষে সেবার হাত সব সময় প্রসারিত করেছেন। এমনি আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে তার বাস্তব মানব সেবার। "মা" শব্দটির মাঝে আছে এক অসাধারণ মধুময়তা আর বিশাল শক্তি। তাই তো শিশুরা ভয় পেলেই মা বলে চিৎকার করে ওঠে। মা সব ত্যাগস্বীকার করেন, সব কষ্ট সহ্য করেন হাসিমুখে। বিশ্ব ইতিহাসের তিনি এক কিংবদন্তী, করুণাময়ী, মমতাময়ী, দয়াময়ী এবং সেবার মা। সেই মহীয়সী নারী বিশ্বনন্দিত মাদার তেরেজা। সবার প্রিয় একটি নাম, একটি ইতিহাস, মানবতা ও মানব সেবার জীবন্ত সাক্ষী, অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির দূত, খ্রিস্টের বিশ্বস্ত অনুসারী। তিনি আজ স্ব-শরীরে পৃথিবীতে নেই কিন্তু তিনি আছেন আমাদের সবার হৃদয়ে। দরিদ্র, অসহায়, রুগ্ন, পিড়ীত, অনাথ-এতিম, অন্ধ-খঞ্জ-বিকলাঙ্গ এবং এ ধরণের লোকেরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল বুকভরা ভালবাসা, মাতৃসুলভ সেবা-যত্ন এবং শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী। জগতের মানুষ তো সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, যেন কেউ কারো নয়। এমনই পৃথিবীতে খ্রিস্টের ভালবাসার সাক্ষ্য দিলেন মাদার তেরেজা। মহীয়সী নারী মাদার তেরেজা। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট যুগোস্লাভিয়ার স্কপেজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম নিকোলা বেজাশিউ, আর মাতার নাম মাড্যান ফিলরোজা।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে, তিনি আজীবনের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সেদিন তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে বলেছিলেন "SPOUSE OF JESUS FOR ALL ETERNITY" সেদিন থেকেই তাঁকে মাদার তেরেজা নামে ডাকা হয়। মাদার তেরেজা মাত্র পাঁচ (৫) টাকা মূলধন নিয়ে সেবাধর্মের কাজ শুরু করেন। মাদার কোলকাতা সবজি বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন দরিদ্রদের জন্য। এইভাবে ঘুরে-ঘুরে টাকা সংগ্রহ করার জন্য এক সকালে প্রথমে এক সবজিওয়ালার দোকানে টাকার জন্য ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। দোকানদার বিরক্ত হয়ে তাঁর হাতে থুথু দিলেন। মাদার তেরেজা বিরক্ত হলেন না। তিনি তাঁর বাম হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন–থুথু তো আমাকে দিলেন, এখন আমার বাচ্চাদের জন্য কিছু দিন। লোকটি অবাক হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন আমার ভুল হয়ে গেছে, মাদার আমায় ক্ষমা করে দিন। তখন সব্জীওয়ালা তাঁর হাত জল দিয়ে ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিলেন এবং টাকাও দিলেন। মাদার তেরেজা তাকে ক্ষমা করে দিলেন ও বললেন তোমার বেঁচা-কেনা ভাল হবে। এই বলে আশীর্বাদ করেন, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, এরপর মাদার সেই স্থান থেকে চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরই সব্জিওয়ালার বেঁচা-কেনা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মাদার তেরেজার আশীর্বাদ আমাদের সকলের খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে এই করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ এর মহামারীকালে। প্রতিদিন তিনি সেবাকাজের পূর্বে পবিত্র খ্রিস্টযাগের

মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে শক্তি সঞ্চয় করতেন। সার্বক্ষণিক পবিত্র জপমালা তার হাতেই থাকতো। তিনি সমাজের উপেক্ষিত, অবহেলিত, নিপীড়িতদের সেবার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের সেবা প্রকৃত মাহাত্ম্য খুঁতে পেতেন। সাধ্বী মাদার তেরেজা বলেন- আপনি যদি প্রার্থনা করেন, আপনি বিশ্বাস করবেন, আপনি যদি বিশ্বাস করেন আপনি ভালবাসবেন এবং আপনি যদি ভালবাসেন আপনি সেবা করবেন।

একজন লোক মাদারকে বলেছিলেন, "দশ লক্ষ ডলার দিলেও আমি কুষ্ঠরোগীকে ছোঁবো না। উত্তরে মাদার বলেছিলেন আমাকে বিশ লক্ষ ডলার দিলেও আমি ছোঁবো না। তবে ডলার নয়- ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার জন্য আমি আনন্দের সঙ্গে বিনামূল্যেই কুষ্ঠরোগীদের সেবা করি"।

বিশ্বের প্রায় পঁচাত্তরটি দেশে নির্মল হৃদয় সেবা আশ্রম, অনাথ আশ্রম চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই স্থানে কত লক্ষ-লক্ষ নিরীহ মানুষ সেবা, ভালবাসা পেয়ে কেউ নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন, আবার নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে অকৃত্রিম ভালবাসা ও সেবা পেয়ে শুভ নিদ্রায় পরলোকগমন করেছেন। এ সেবার যোগ্য পুরষ্কার ঈশ্বর তাকে প্রদান করেছেন। সাধ্বী তেরেজার উপাধি লাভ করে বিশ্ববাসীর কাছে চির-স্মরণীয়, বরণীয় ও শ্রদ্ধার মা জননী, মানবতার রাণী মাদার তেরেজা, মানবতার মা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সংলাপ মাদার তেরেজা, আদর্শ জননী, স্নেহময়ী মা তেরেজা, আরও কত উপাধি। তিনি সত্যই চেয়েছেন মানুষ যেন ঈশ্বরের শান্তি, আনন্দ, ভালবাসায় জীবন কাটাতে পারে এবং প্রত্যেক মানুষ যেন "শান্তির দূত" হয়ে শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলেন। ঈশ্বরের করুণা নিজে লাভ করে অপরের কাছেও পৌঁছেও দিতে পারে।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৫, সেপ্টেম্বর মাদার বিশ্ববিখ্যাত নোবেল শান্তি পুরষ্কার লাভ করেন এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি "ভারত রত্ন" খেতাবে ঘোষিত হন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৫ সেপ্টেম্বর মাদার তেরেজা পার্থিব জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ১৩ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সম্মানের সাথে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তার মৃতদেহকে সমাধিস্থ করেন।

মিশনারীজ অব চ্যারিটি মাদার হাউজে তার মৃতদেহের সমাধি দেওয়া হয়। মৃত্যুকালীন তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। আমাদের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ৪ সেপ্টেম্বর রোম নগরীতে সাধু পিতরের মহামন্দির চত্বরে লক্ষ-লক্ষ মানুষের সমাবেশে কলিকাতার মাদার তেরেজাকে সাধ্বীরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন।

হে অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর, তুমি সাধ্বী মাদার তেরেজাকে এই জগতে শান্তির দূত হিসেবে দীন-দুঃখির কাছে তোমার প্রেমবাণী প্রচার করতে পাঠিয়েছিলে। তিনি সেই দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে তোমার কোলে ফিরে গেছেন। তিনি যে আদর্শ আমাদের তথা বিশ্ববাসীর কাছে রেখে গেছেন, সে আদর্শে যেন জগতের আরও অনেক মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে সেবার আহ্বানে সাড়া দেয়, তুমি সেই ইচ্ছা তাদের অনন্তে জাগিয়ে তুলো।

আজ আমরা তার কথা স্মরণ করি, তাকে আমাদের প্রণাম শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাস সংঘের সকল সভ্য-সভ্যাদের জন্য প্রার্থনা করি, যেন তারা সাধ্বী মাদার তেরেজার সেবার আদর্শকে সামনে রেখে জগতের খ্রিস্টের ভালবাসার সাক্ষ্য দিতে পারে॥ ■

তথ্যসূত্র : সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে লেখা বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে।

বন ও বনভূমি মানুষ প্রেমিক ফাদার হোমরিক সিএসসি *(১৪ পৃষ্ঠার পর)*

সকল আদিবাসীদের অন্যত্র সরিয়ে সেখানে চা বাগানের প্রস্তাব নিয়ে ফাদার হোমরিকের কাছে আসে। এ পরিকল্পনার কথা কেমন করে যেন কেউ-কেউ জানতো। এক পর্যায়ে মাওবাদী উগ্র সশস্ত্র দল কর্ণেলের সাথে দলকে ঘিরে ফেলে এবং মেরে ফেলার উপক্রম করে। ফাদার তাদের নিবৃত্ত করেন এবং কর্ণেলক্সকে সম্মানের সাথে চলে যেতে সাহায্য করেন। পরে জানা যায় এরা প্রায় সবাই এবং তাদের আত্মীয়রা এ ক্লিনিক থেকে চিকিৎসা নিত। সে কর্ণেল বা সেনাবাহিনীর আর কেউ পরবর্তীতে আর আসেনি।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে গারো প্রতিবাদী নেতা ও মানবাধিকার কর্মী কলেস রিচিলকে বন বিভাগের প্ররোচনায় জিজ্ঞাসাবাদের নামে সেনাবাহিনী তুলে নেয়। ২ দিন পরে রিচিলের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ বনের মধ্যে পাওয়া যায়। এ ঘটনা এলাকায় বিরাট ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফাদার হোমরিক এ খবর ও ছবি ঢাকায় মানবাধিকার কমিশনে দেন। তাদের মারফত মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমা দূতাবাস জানাতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিদেশী পত্রিকায়ও এ খবর প্রকাশিত হয়েছিল। US Ambassador বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চতর কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন এবং Human Rights Group অনুসন্ধানী দল পাঠায়। সেনাবাহিনী ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদ্বয়কে প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তীতে নব্বইয়ের দশকেও দু'টি ঘটনা ঘটে। ময়মনসিংহ থেকে জলছত্র ফেরার পথে দু'জনকে বাস থেকে নামিয়ে নেয় সেনাবাহিনী। এদের একজন ছিল বন থেকে গারোদের সরিয়ে পার্ক তৈরীর প্রচণ্ড বিরোধিতাকারী অন্যতম নেতা। দুজনের প্রথমজনকে নির্যাতনে হত্যা এবং অন্যজনকে সারাজীবনের তরে পঙ্গু করে দেয়া হয়। আর একবার এক মহিলা activist কে কারা যেন হত্যা করে ফেলে রেখেছিল। সে সময় সারা গারো সমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেছিল। আমি তখন অবিভক্ত বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল। এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তখন ডানিয়েল কোড়াইয়া। আমরা সেদিন বিক্ষুব্ধ গারো যুবক ও ছাত্রন্তাদের সাথে আলোচনাকালে তাদের প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও শব্দ চয়নে শুধু ফাদার হোমরিকের শিক্ষা বিস্তারের কথাই ভেবেছি।

ফাদার হোমরিক ছিলেন গারোদের সুখ-দুঃখের সাথী এবং অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সবার কণ্ঠস্বর। গারোরা সবাই বিশ্বাস করতো গারো পাহাড়ের জঙ্গলে সুদূর আমেরিকা থেকে সৃষ্টিকর্তার পাঠানো ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসি না আসলে গারোরা সারাজীবন সমস্যার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকতো।

ফাদার হোমরিক সিএসসি সহজ, সরল আদিবাসী গারো জাতিকে 'ঈশ্বরের চোখ' বলে আখ্যায়িত করে গারো পাহাড় আর মধুপুরের বনভূমিকে তাঁর স্বর্গের 'এডেন উদ্যান' বলে ভাবতেন এবং এখানেই সারাজীবন গারো জাতির মাঝে ও শালবনে গারো হয়ে কাটানোর ইচ্ছা পোষণ করতেন। এ যেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার প্রতি'র মতই তাঁর সারাজীবনের উচ্চারণ:

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান।"

যদিও ফাদার হোমরিচ সিএসসি চেয়েছিলেন মৃত্যুর পরে তাঁর স্বর্গের 'এডেন উদ্যান' এ বনভূমিতে চিরনিদ্রায় সমাধিস্থ হতে কিন্তু তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যও পরিবারের ইচ্ছায় তাঁকে USA তে ফিরতে হলো এবং সেখানেই তিনি গত ২৫ জুলাই ৯২ বছর বয়সে পরপারে চলে যান।

ঈশ্বরের পাঠানো স্বর্গীয় দূত ফাদার ইউজিন এডুর্য়াড হোমরিক মর্তে এসে মধুপুর শালবনে পেয়েছিলেন তাঁর 'এডেন উদ্যান' এবং যেখানে উনি শান্তিতে ঘুমাতে চেয়েছিলেন অনন্তকাল, সে সুযোগ না দিয়ে ঈশ্বর তাঁকে যখন তুলে নিলেন তখন ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গের ফুলেল বাগানেই রাখবেন বলে আমরা বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি। -আমেন॥

https://zoutu.be/ZtsoJzzMSiU

https://zoutu.be/SVAJ-gLErdI

** কিছু তথ্য Wall Street Journal, NY.* ■

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

নোয়েল গমেজ

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আঠারোগ্রাম অঞ্চলে পবিত্র জপমালা রাণী ধর্মপল্লীর হাসনাবাদ গ্রামে তাঁর জন্ম ও বাপ্তিস্ম, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি পবিত্র ভস্ম বুধবারে। বাবা নিকোলাস কমল গাঙ্গুলী ও মা কমলা গাঙ্গুলী। বাবা পেশায় কুক (বাবুর্চী) এবং মা গৃহিনী। ছোটবেলা থেকেই থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, মেধাবী ছাত্র। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে তিনি বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। তখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ক্লাসে তিনি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে প্রথম হতেন। দ্বিতীয় হতেন তাঁর সহপাঠী কলকাতার বিশপ লিনুস গমেজ। আর তৃতীয় স্থান অধিকার করতেন গোল্লা ধর্মপল্লীর পরলোকগত জন খাঁ। বিশপ ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রমনা ব্যক্তি এবং দরিদ্রদের বন্ধু। বড় ভাই জেভিয়ার ও ছোট ভাই বিমল একসাথে পড়াশুনা, খেলাধুলা, প্রতিদিন সকালের পবিত্র খ্রিস্টযাগেও অংশগ্রহণ করতেন। শুরু হয় তাঁর যাজক হবার কৃচ্ছ্রতা সাধনা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। রাঁচীর সেন্ট আলবার্ট সেমিনারীর পড়াশুনা শেষ করে তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন ২৬ বছর বয়সে একজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক পদে অভিষিক্ত হন। দেশে ফিরে নব অভিষিক্ত ফাদার থিওটোনিয়াস প্রথম কর্মস্থল হল বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীর সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। সাধারণ অথচ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক। বিশুদ্ধ উচ্চারণ মধুর সুরে সেমিনারীদের সাথে কথা বলা তাঁকে করে তুলেছিল সকলেই প্রিয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তিনি জীবনভর পালন করে গেছেন প্রভুর আদেশবাণী। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ সবই তিনি ঢেলে দিয়েছেন প্রভুর চরণতলে। তাই তিনি তাঁর মহৎ কর্মগুলো বিশ্বস্তভাবে পালন করেছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকার নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ১০ আগস্ট সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। আমেরিকা থেকে ফিরেই সেন্ট গ্রেগরীস্ কলেজ (বর্তমান নটরডেম কলেজ) তিনি যুক্তিবিদ্যা পড়াতেন। সাতটি ভাষা তিনি বলতেন ও লিখতে পারতেন। তিনি লাতিন ভাষাও জানতেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ১২ এপ্রিল তিনি নটরডেম কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ এবং ৩০ আগস্ট তিনি প্রথম বাঙালি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। তিনি ছিলেন সাহসী ও স্পষ্টবাদী, সঠিক জায়গায় কঠিন কথা বলতেও তার মধ্যে কোন দ্বিধাবোধ ছিল না। তিনি মানুষকে সহজেই বিশ্বাস করতেন; মানুষও তার ব্যবহারে খুশী হয়ে বিশ্বস্ততার সাথে তার কাজ করে দিতো। এজন্যই মানুষ তাঁকে এতো ভালবাসতো। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস সকল ফাদার-ব্রাদার সিস্টার খ্রিস্টভক্তকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সকল গির্জা, স্কুল, কনভেন্ট, বাড়ি-ঘরে বিপদগ্রস্তদের আশ্রয় ও

প্রয়োজনীয় সকল সেবা প্রদান করা হয়। তিনি নিজের জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানি আর্মিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কোন কোন সময় পায়ে হেঁটে, কোন সময় বাইসাইকেল চড়ে বিভিন্ন এলাকায় সাহায্য করেছেন এবং সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সেই সময় আর্চবিশপ গাঙ্গুলী, খুলনার বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও এবং চট্টগ্রামের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে একটি সোনার ক্রুশ ও সোনার চেইনসহ বিশ লক্ষ টাকার চেক এবং কোর-এর কাজের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে দেন। নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করার মাত্র ৪দিনের মাথায় অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মহামান্য পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন ফাদার থিওটোনিয়াসকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ হিসেবে মনোনীত করেন। মহাধর্মপ্রদেশের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনারের পদত্যাগের পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাঙালি প্রথম আর্চবিশপ হিসেবে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা দেয়া হয় ২১ জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি, প্রার্থনা ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রার্থনা থেকে তিনি শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি রমনা ক্যাথিড্রাল চ্যাপেলে প্রার্থনা, ধ্যান ও খ্রিস্টযাগের জন্য উপস্থিত থাকতেন এবং বিকেলে চা-নাস্তা খাওয়ার পূর্বে তিনি একই চ্যাপেলে ঘন্টাখানেক সময় প্রার্থনায় কাটাতেন। তাঁর মধ্যে কোন ধরণের আত্মগরিমা প্রকাশ পায়নি। কথা ও কাজে কাউকে কষ্ট না দিতে তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। আর্চবিশপ গ্রামের এক মাসির বাসায় দাওয়াতে গেলেন। তাঁর সাথে কিছু ফাদারও গেলেন। ফাদারগণ মাসীকে আগেই বলেছিলেন, আর্চবিশপ শূকরের মাংস খান না, এলার্জীর সমস্যা আছে। কিন্তু মাসি খুশীতে তা ভুলে গিয়ে, শূকরের মাংসও রান্না করলেন। আর্চবিশপ সব খাবার খেলেন কিন্তু শূকরের মাংস খেলেন না, তাতে মাসী মনে কষ্ট পেলেন। বিশপ তাঁর কষ্ট বুঝতে পারলেন। তাই আর্চবিশপ বললেন মাসি আবার আসবো, আপনার হাতের রান্না করা শূকরের মাংস খাবো। এরপর কয়েকমাস পর মাসির বাসায় গেলেন, দুপুরের খাবার খেলেন। প্রথমেই তিনি শূকরের মাংস এর কারী খেলেন। তখন মাসি এতো খুশী হলেন, যা বলার মতো নয়।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও নানাবিধ চাপে তিনি স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন না নেওয়ায় দিনে দিনেই দুর্বল হয়ে পড়েন। শুক্রবার, বিকেল ৩:৪৫ মিনিট, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। রবিবার, সেপ্টেম্বর চার হাজারো শোকার্ত ভক্তের চোখের জলে রমনা ক্যাথিড্রালে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন স্থানে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আর্চবিশপকে সাধুশ্রেণীভুক্ত ঘোষণার প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে 'ঈশ্বরের সেবক' বলে বিঘোষিত। এই মহান সাধু-প্রতিম ব্যক্তির জীবনাদর্শ ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী সকল ব্রতধারী ভাই-বোন, খ্রিস্টভক্ত জনগণেরই জানা প্রয়োজন ও অনুকরণীয়। হে প্রভু তোমার বিনম্র সেবক, আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে ধন্য বলে মহিমান্বিত কর, তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি কর এবং তাঁর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করো এই আমাদের প্রার্থনা॥ ■

বন ও বনভূমি মানুষ প্রেমিক ফাদার হোমরিক সিএসসি

ডা. নেভেল ডি রোজারিও

Fr. Eugene Edward Homrich, CSC গত ২৫ জুলাই, ২০২০ COVID-19 এ আক্রান্ত হয়ে Holy Cross House, Notre Dame Indiana, USA তে ৯২ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে Holy Cross Priest হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রৈরিতিক কাজে এসে প্রায় ৬০ বছর বৃহত্তর ময়মনসিংহের মধুপুর বনাঞ্চলের জলছত্র ও পরবর্তীতে পীরগাছা ধর্মপল্লীতে গারো আদিবাসীদের মাঝে কাজ করেন।

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের মাসকেগান (Muskegon) শহরে এক কারখানা শ্রমিক বার্ণাড হোমরিক ও ঈলা হোমরিক এর ঘরে ৬ সন্তানের অন্যতম ফাদার ইউজিন হোমরিক ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২য় মহাযুদ্ধ চলাকালীন স্কুলে প্রায় সময় আসা কাথলিক মিশনারীদের দেখে ঈশ্বরের আহ্বানে মানবের সেবার জন্যে ব্রতীয় জীবনের প্রতি তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নিজেকে মিশনারী কাজে উপযোগী করার জন্যে Notre Dame University, Indiana ও Holy Cross College in Washington DC তে অধ্যায়ন করেন। সেসময় Catholic Religious Congregation "Holy Cross" এর মিশনারী কার্যক্রম শুধুমাত্র তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিস্তৃত ছিল। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে যাজক পদে অভিষিক্ত হয়ে Fr Eugene Homrich csc ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আরো ১২জন Holy Cross ব্রাদার-ফাদারদের দলের সাথে মাত্র ২৭ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরিত হন। ঢাকা থাকাকালীন বাংলা ভাষা আয়ত্ত্ব করে ১৯৫৬-৫৮ পর্যন্ত নবাবগঞ্জ থানাধীন গোল্লা ধর্মপল্লীতে St. Francis Xavier Church এ প্রৈরিতিক কাজ করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলের জলছত্র Corpus Christi Catholic Church মিশনে প্রেরিত হন। সেখানেই শুরু হয় তাঁর 'অরণ্যে দিনরাত্রি'র যাপিত জীবন। ভালো লাগা ও ভালবাসা শুরু হয় বনের বৃক্ষরাজি আর বনবাসী জনগণকে। ফাদার হোমরিক সিএসসি বিশ্বাস করতেন যে গারোদের কাছাকাছি পৌঁছাতে হলে তাঁকে গারোদের ভাষা, কৃষ্টি এবং জীবন-প্রণালী-জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে হবে। আর তাই তিনি তাঁর প্রৈরিতিক কাজের শুরুতেই গারোদের ভাষা আয়ত্ত্ব করতে ব্রতী হলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গারো ভাষায় পারদর্শীতা অর্জন করলেন। এমনকি উনি ২য় ভাতিকান মহাসভার আলোকে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও উপাসনা গারো ভাষায় শুরু করলেন। খ্রিস্টীয় ধর্মীয় রীতি-নীতির পাশাপাশি গারো সংস্কৃতি সংরক্ষণে তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল ও যত্নবান হলেন। জলছত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি St. Paul's Church, Pirgachha and Christ the King Church, Dorgachala স্থাপন করেন। তিনি শুধু গারোদের মাঝে প্রভুর মঙ্গলবার্তা পৌঁছে দিয়ে ক্ষান্ত হন নাই বরং তাদের মাঝে শিক্ষা বিস্তার, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ভূমি রক্ষা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ, আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন।

গারোদের মধ্যে অনাদিকাল থেকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস। তারা বিভিন্ন দেব-দেবীত্বে বিশ্বাস করতো। "আমরা শুধু তাদের এবং তাদের সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছি"। সংস্কৃতিকে নষ্ট করে ধর্মান্তকরণকে ক্ষণকালীন স্থায়ী এক ধরণের 'শুষ্ক প্রক্রিয়া' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে তাতে স্থানীয় সংস্কৃতিকরণ করা হলে ধর্মবিশ্বাস গভীরে প্রোথিত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ যেন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ২য় ভাতিকান মহাসভার দলিলে উল্লিখিত 'মণ্ডলীর সংস্কৃত্যয়ন (inculturation) এর বাস্তব অনুশীলন।

শিক্ষককে যে কোন জাতির মেরুদণ্ড আখ্যায়িত করে তিনি গারোদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রাইমারী ও হাই স্কুল পর্যায়ের প্রায় ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি গারোদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে দেশের পরিবর্তনশীল সময়ে শিক্ষা ছাড়া অধিকার অনুধাবন করা এবং তা আদায় করা কোনমতেই সম্ভব নয়। এজন্যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা, মানবাধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে সততার সাথে একত্রিত হয়ে অধিকার আদায় করতে হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে তিনি গড়ে তোলেন বিভিন্ন সমবায় সমিতি। গারোরা আদিকাল থেকে 'জুম চাষ' এ অভ্যস্ত ছিল এবং জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্যে ১ বছরের জন্যে জমি বিশ্রামে রাখতো। ফাদার হোমরিক বিকল্পে গারোদেরকে আধুনিক কৃষিতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে তুললেন।

পাক-ভারত উপমহাদেশের জনগণের প্রায় সবাই ব্রিটিশ শাসন আমলের আগে থেকেই হিন্দু কিংবা ইসলাম ধর্মবিশ্বাসী ছিল। গারোসহ অনেক আদিবাসীদের প্রায় সবাই ছিল প্রকৃতি পূজারী কিংবা সন্ন্যাসধর্মী। সে আমলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দু বা মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের তেমন কোন কর্মতৎপরতা দেখা যায়নি। খ্রিস্টান মিশনারীগণ তাঁদের ধর্মবাণী প্রচারে এবং পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রৈরিতিক কাজ শুরু করে খুব সহজেই আশাতীত সফলতা পান। 'আরণ্যক' নাট্যদলের মামুনুর রশীদের 'রাঢ়াঙ' নাটকে সাওতালদের মাঝে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের কাহিনীর কিছুটা তুলে ধরা হয়েছিল।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের কুখ্যাত গর্ভনর মোনেম খানের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে গারোদের বসত-বাড়ি দখল করত তাদেরকে উদ্বাস্তু করে ভারতে ঠেলে দেয়া হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে ময়মনসিংহ বর্ডার দিয়ে এক বিশাল ট্যাংক বাহিনী নিয়ে ভারতীয় পদাতিক বাহিনী পূর্ব-পাকিস্তান দখলে আসছে এ খবরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কয়েকটি ব্রিগেড জলছত্র মিশনসহ এক বিশাল এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করে। সমতল ভূমি থেকে আসা বহিরাগতরা তাদের দখলদারিত্ব প্রসারের সুবিধার জন্যে মিথ্যা অপরাধ দিয়ে প্রতিনিয়ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দিয়ে গারোদের হেনস্থা ও নির্যাতন করাতো। গারোরা ভারতের দালাল

ও গুপ্তচর এ বিশ্বাসে পাকিস্তানি সেনারা বর্ডার এলাকার গারোদের এলাকা ছাড়া করতে তৎপর হলো। বহু গারো পরিবার পাক-সেনাবাহিনীর ভয়ে ভিটাছাড়া হয়ে ভারতে আশ্রয় নিলো। যুদ্ধশেষে স্বদেশে ফিরে তারা তো কিছুই পেল না বরং জীবন নাশের হুমকি নিয়ে ফিরে গেলো পরদেশে। সে সময় ফাদার পোপ সিএসসি, ফাদার হোমরিক সিএসসি স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেও কিছু করতে পারলেন না। পক্ষান্তরে ফাদার পোপ সেনাবাহিনী দ্বারা নিগৃহীত হলেন। ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেণার সিএসসি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারী প্রশাসনের কাছ থেকে কোন সমাধান না পেয়ে কাথলিক মুখপত্র 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' তে প্রকাশিত তাঁর বড়দিনের বাণীতে হতাশার কথা তুলে ধরেন। ভারতের নরসিংহ রাঁও সেসময়ে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশে আদিবাসী নির্যাতন ও তাদেরকে ভারতে ঠেলে দেয়ার কথা তুললে পাকিস্তানের তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপের পাল্টা অভিযোগ আনেন। প্রতি উত্তরে নরসিংহ রাঁও শুধু বলেন, Mr. President, I Narasimha Rao can lie, Mr. Bhutto can tell a lie but the Archbishop of Dhaka cannot lie বলে ভারতীয় ও বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় অনুদিত 'প্রতিবেশী' পত্রিকার আর্চবিশপ গ্রেণারের বাণীটি পড়ে শোনান। চরমভাবে অপমানিত ও রাগান্বিত হয়ে ভুট্টো তার প্রতিনিধি দল নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন ও পরিণামে নেমে আসে আর্চবিশপ মহোদয়ের উপর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা। আর্চবিশপের উপর ঢাকার বাইরে যাবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। জানানো হলো দেশের বাইরে একবার গেলে আর আসার অনুমতি দেয়া হবে না। মূলত তাঁকে House Arrest এর মত করে গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হল। এ হেন অবস্থায় ভাতিকান এবং Holy Cross Congregation-এর পরামর্শে তিনি ঢাকা ত্যাগ করে নিজ দেশ USA তে চলে যান এবং প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ হিসেবে 'ঈশ্বরের সেবক' আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী সিএসসি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ফাদার হোমরিক সিএসসি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও ভারত থেকে আনা তাদের অস্ত্রাদি ও গোলাবারুদ রাখায় সহায়তা করার কারণে হানাদার পাকিস্তানি সেনারা জলছত্র মিশন আক্রমণ করে ফাদার হোমরিকসহ ৩২জন গারোকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের সবাইকে দেশদ্রোহী, বিদ্রোহীদের সহায়তা করাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা জানানো হয়। অকুতোভয় সাহসী ফাদার হোমরিক জানতেন অনেক পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা US ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তিনি সাহস করে কমাণ্ডারকে প্রশ্ন করলেন অফিসার কোন দেশ থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। অফিসার জানালো "Camden, New Jersey" ফাদার হোমরিক জিজ্ঞেস করলেন যে উনি কি চান যে আমেরিকার জনগণ পরদিনের পত্রিকার শিরোনাম থেকে জানুক যে আমেরিকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন অফিসারের গুলিতে একজন আমেরিকান পাদ্রীকে হত্যা করা হয়েছে। পাক-অফিসার তখন ফাদারসহ সবাইকে মুক্তি দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোটা সময় ফাদার আশেপাশের হিন্দু ও আদিবাসী উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেন এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযাদ্ধাদের চিকিৎসাসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতার জন্যে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর পরই 'মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছিল। ফাদার হোমরিক তাঁর প্রবেশ পথের দরজার উপরে তা গর্বের সাথে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্যে ফাদার হোমরিক সিএসসি আরো পাঁচজন কাথলিক পাদ্রীর সাথে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে 'Friends of Bangladesh' সম্মানে ভূষিত হন।

ফাদার হোমরিক সিএসসিকে আমি প্রথম দেখি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে জলছত্র মিশনে। আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী সিএসসি'র মৃত্যুর পর দিনাজপুরের বিশপ মাইকেল রোজারিও'র অভিষেক অনুষ্ঠানের আগে তাঁর সাথে ফাদার জ্যোতি, মাউসাইদের ফাদার কমল, নিধনদা, মার্কদা ও আমি সদলবলে হালুয়াঘাটের বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সড়ক পথে যাচ্ছিলাম। তখনো ময়মনসিংহ যাবার shortcut রাস্তা ঢাকা-সালনা সড়ক হয়নি। কালীগাতি হয়ে দীর্ঘপথ আর্চবিশপ মাইকেল একাই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। আমি বসেছিলাম তাঁর পাশে আর আমার পাশে ফাদার জ্যোতি, পেছনের সিটে বাকী ৩জন। আর্চবিশপ মাইকেল ছিলেন সে সময় যা বলে chain smoker. উনি ধুমপান করতেন Capstan সিগারেট। গাড়ী চালানোর সারাটা পথ আমাকে ঘন-ঘন সিগারেট ধরিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিতে হলো। আমরা যাত্রাপথে আহার বিরতিতে জলছত্র মিশনে ফাদার হোমরিক সিএসসি'র অতিথি হলাম। সে সময়ে হালুয়াঘাট যাবার পথের সেতু ছিল না-আমরা গাড়ী নিয়ে ফেরীতে পার হয়ে ১২ ঘন্টার পথ চলে গন্তব্যস্থল বিড়ইডাকুনী মিশনে পৌঁছালাম। তিন দিনব্যাপী সমাবেশের ফাঁকে মিশনের কাছাকাছি প্রমোদ মানখিন ও পরবর্তীতে গারো সম্প্রদায়ের নেতা নাইট মনীন্দ্র রেমা (ডা: উইলিয়াম ম্রং এর বাবা) এর বাড়িতে যাই। ফিরতি পথে প্রস্তাবিত ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় উপস্থিত হই।

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এবং দেশ-প্রেমের মহান ব্রতে গারো যুবকদের এক বিরাট অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের আমলে তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। তাই মুজিব হত্যার পরে তাদের অনেকে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রতিবাদী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ফলে আবার গারোদের উপর নেমে আসে নিপীড়ন ও অত্যাচার। অনেকে মৃত্যুবরণ করে, ধর-পাকড় হয় অনেক, অনেকে হয় পলাতক। কারো-কারো উপর এলাকা ছাড়ার উপর ছিল নিষেধাজ্ঞা। এমনি একজন ছিল আমার বন্ধু, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা, ২০১৯ এ ডেঙ্গুজ্বরে মৃত্যুবরণকারী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ডা: উইলিয়াম ম্রং।

মধুপুর বনাঞ্চল থেকে বিতাড়িত বাস্তুহারা পরিবারের সন্তান কে সাংমা ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলে ভারতীয় লোকসভার স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গারো পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী জনপদের বনাঞ্চলের আদিবাসীদের নিকট ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগতভাবে ভূমি অধিকারের কোন দালিলিক প্রমাণ ছিল না। আর সমতলভূমি থেকে আসা দখলধারী ও বসতি স্থাপনকারী প্রায় সবাই ছিল ভূমিদস্যু। সে কারণেই আদিবাসীদের সাথে জমি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে দখলদারদের সাথে আদিবাসীদের অহরহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। রাষ্ট্রীয় প্ররোচনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রশাসনিক সংশ্লিষ্টতা ও সহযোগিতায় অবস্থা এমন পর্যায়ে যেত যে আদিবাসী জনপদের অনেকে উদ্বাস্তু হয়ে দেশান্তর হয়ে ভারতে যেতে বাধ্য হতো।

পঞ্চাশের দশকে বিদুৎবিহীন জলছত্র ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চল। পুরো মধুপুর বনাঞ্চলে ছিল না কোন উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, ছিল না কোন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। ম্যালেরিয়া, কালো জ্বর আর কলেরা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক। প্রায় প্রতিদিন কেউ না কেউ মারা যেত। ফাদার হোমরিক সিএসসি পুরো এলাকার মানুষের জন্যে শুরু করেন মিশন দাতব্য ডিসপেনসারী। ফাদারের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে শুধুমাত্র খ্রিস্টানরা উপকৃত হয়নি আশেপাশের সবাই এ কেন্দ্র থেকে সেবা পাওয়াতে আশেপাশের অনেকের প্রিয়জনে পরিণত হয়ে ওঠেন ফাদার হোমরিক সিএসসি। একবার সেনাবাহিনীর এক কর্ণেল, যিনি সরকারের চা বোর্ডের পরিচালক

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বরণ করে নেবে তো আমায়

গৌরব জি. পাথাং

নির্মাল্য হাসপাতাল থেকে বেড়িয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। এমন দুশ্চিন্তা জীবনে আর কখনও অনুভব করেননি।

না। বাসায় ফেরা যাবে না। বাসায় তো মা-বাবা, স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে আছে। ওদের যদি কিছু হয়ে যায়? আমার জন্য ওরা মরবে, তা হয় না। যদি মরতে হয় আমি একাই মরব। ওদেরকে ওর মধ্যে জড়াতে চাই না। পথ চলতে-চলতে নির্মাল্য ভাবতে লাগলেন, আজকে আমি দূরত্ব বজায় রাখব, কালকে প্রিয়জনকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য। আজকে থেমে থাকব, আগামীতে দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে যাবার জন্য।

এখন কোথায় যাই? হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা নেই। বাসায় যাওয়া যাবে না, হোটেল বন্ধ, গির্জা-মন্দির-মসজিদ সবই তো বন্ধ।

ঐ তো গির্জায় সন্ধ্যার ঘন্টা শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাকেই ডাকছে। যাই, গিয়ে দেখি। কতদিন এই ঘন্টার ডাক অমান্য করেছি। শুনেও না শোনার মত পাশ কাটিয়ে গিয়েছি। কিন্তু আজ এত আপন মনে হচ্ছে কেন? এই গির্জা, এই স্কুল-হোস্টেল কত আপন মনে হচ্ছে। যাকে এতদিন অবজ্ঞা করেছি, সে কি বরণ করে নেবে আমায়?

যাই, গিয়ে দেখি। যিশু করুণাময়। যারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করেছে, তিনি যদি তাদেরকেই ক্ষমা করতে পারেন, তাহলে আমাকে কি ক্ষমা করতে পারেন না? নিশ্চয় পারেন।

নীরব নির্জনতায় গির্জার প্রদীপগুলো জ্বলছে। ফাদার ফ্রান্সিস জানুপাত করে ক্রুশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছেন, "হে করুণাময় যিশু, বিশ্ব মানবজাতিকে এই করোনা নামক মহামারীর হাত থেকে রক্ষা কর---।"

চুপি-চুপি নির্মাল্যও অস্ফূতভাবে প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। কতদিন হয় প্রার্থনা করেন না। হাসপাতাল আর পরিবারে আনাগোনা করেই দিন কেটে যায়। বছরে দু'য়েকবার আসা হয়। বড় প্রোগ্রাম ছাড়া বেশি আসা হয় না। বড় অবহেলা করেছেন। কত নির্মম পরিণতি! যাকে এতদিন অবহেলা করেছেন, আজ তার কাছেই দুর্দিনে আসতে হল। না, বেশিক্ষণ প্রার্থনা হল না। বড়ই চঞ্চল-অস্থির মন। শান্ত করতে সময় লাগবে।

প্রার্থনা শেষ করে গির্জা থেকে বেড়িয়েই দেখতে পেলেন নির্মাল্য দাঁড়িয়ে আছেন। নির্মাল্য হাত জোড় করে বললেন, যিশু প্রণাম ফাদার।

যিশু প্রণাম। কেমন আছ?

ফাদার এমন দিনে কি করে ভাল থাকি, বলেন তো?

ডাক্তার সাহেব, তুমি যদি ভাল না থাকো, তবে আমার মত এই বুড়ো মানুষ কি করে ভাল থাকবে? তুমি কিন্তু খুব ভাল কাজ করে যাচ্ছ। শুনেছি, জীবন বাজি রেখে দিন-রাত মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছ।

হ্যাঁ ফাদার, সেই জন্যই তো আজ আমাকে ঘর ছাড়তে হচ্ছে। তাই পরিবার রেখে আপনার কাছে ছুটে এলাম।

তুমি আমার সঙ্গে থাকো। আমিও তো সংসারবিহীন মানুষ। একা একা থাকি। তুমি থাকলে নিসঙ্গতা দূর হবে। জানো তো, এতদিন একাকীত্ব অনুভব করিনি। সর্বদা মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি। সকাল বিকাল সর্বদাই মানুষের আনাগোনা ছিল। গির্জাঘর পরিপূর্ণ ছিল। আর আজ প্রার্থনা করার লোক নেই, গির্জাঘর শূন্য। উপাসনা নেই, বিয়ে নেই, কোন অনুষ্ঠান নেই। চারিদিকে কেবল হতাশা-নিরাশা আর হাহাকার।

ফাদার, সেই জন্যই এসেছি। আমি জানি, আপনি আমায় ফিরিয়ে দেবেন না।

চলো। তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।

ফাদার, আপনার মনে আছে? হোস্টেলে থাকার সময় কত জ্বালাতন করেছিলাম?

হ্যাঁ। তুমি খুব দুষ্ট ছিলে কিন্তু পড়াশোনায় ছিলে খুবই বুদ্ধিমান। তাই তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। ভেবেছিলাম, ছেলেটা দুষ্ট হোক কিন্তু কোন দিন দেশের অমঙ্গল করবে না। একদিন ঠিকই বুঝতে পারবে।

হ্যাঁ ফাদার, আপনার সেই দুষ্ট ছেলেটাই আজ বড় হয়ে দেশের-মানুষের সেবা করছে। আশীর্বাদ করবেন যেন সুস্থ থেকে এই দুর্দিনে মানুষের সেবা করে যেতে পারি।

আশীর্বাদ করছি যেন এমনিভাবে মানুষের সেবা করে যেতে পারো।

গির্জার ঘন্টায় নির্মাল্যের ঘুম ভেঙে গেল। এত সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস নেই। কিন্তু আজ উঠতে হল ফাদারের সাথে প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার জন্য। কারণ ফাদার বলেন, প্রার্থনা আমাদের আত্মার খাদ্য। দৈহিক খাদ্য যেমন করে আমাদের দেহে শক্তি যোগায় ও সুস্থ রাখে, তেমনি আত্মাকে সুস্থ রাখার জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন হয়।

নাস্তা খেয়ে নির্মাল্য হাসপাতালের দিকে রওনা হলেন। দেখতে পেলেন হাসপাতালের সামনে বহু লোকের ভীড়। কারণ অনেক হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নার্স নেই। চিকিৎসার সুব্যবস্থা নেই। অনেক হাসপাতাল নিজেই অসুস্থ, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, লকডাউনে আছে। নির্মাল্য এবং আরো কয়েকজন ডাক্তার ঝুঁকি নিয়ে হাসপাতালে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

এক ছেলে কাঁদতে-কাঁদতে বলছে, ডাক্তার, আমার বাবাকে দেখুন না। রাতে ঘুমাতে পারেন না, শ্বাস-প্রশ্বাসে অনেক কষ্ট। অনেকগুলো হাসপাতাল ঘুরে এসেছি কিন্তু কোথাও ডাক্তার দেখাতে পারিনি।

নির্মাল্য ঐ ছেলের বাবাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন। না, বড় ধরণের কোন অসুখ-বিসুখ নেই। নিদ্রাহীনতা, খাবারে অরুচি আর প্রেসার একটু বেশি। হয়তো এই বৃদ্ধ বয়সে মানসিক টেনশন অনেক কাজ করছে। মনে হচ্ছে "ব্যধির চেয়ে আধিই বড়।" একাকীত্বের যন্ত্রণা কুড়ে-কুড়ে খাচ্ছে। হয়তো কোথাও বের হতে পারেন না। চায়ের দোকানে আড্ডা নেই, বন্ধুদের সাথে দেখা নেই। আশা করি কয়েকদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তাদের এমন ব্যবহারে ছেলেটি খুশী মনে বাড়ি ফিরে গেল।

কয়েক দিন হল সরকার করোনাভাইরাসের টেস্ট ও চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালকে অনুমতি দিয়েছে। যদিও লোকবল, চিকিৎসার সরঞ্জাম খুবই সামান্য তবুও কিছু আত্মত্যাগী ডাক্তার ও নার্স দিন-রাত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আজ ডাক্তারগণ অন্যদের ভাল রাখতে গিয়ে নিজের ভালো'র কথা ভুলেই গেছেন। তাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়ে সব ভুলে গিয়ে অন্যের কথাই ভাবেন। মানুষের প্রতি ভালবাসা না

থাকলে এমন কঠিন কাজ করা যায় না। একদিন ডাক্তার হয়ে মানবসেবার শপথ অর্থাৎ 'হিপোক্রিটাস ওথ' নিয়েছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে আদিগুরু হিপোক্রিটাস একদিন গাছতলায় তার শিষ্যদের জড়ো করে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছিলেন, "--- আমি শপথ গ্রহণ করছি যে, জেনে শুনে এবং ধর্মত রোগীর ক্ষতি হয় এমন কোনো ঔষধ দেব না। শত্রু মিত্রভেদে সব রোগীকে সমান মন-প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করব এবং তার মানসিক দুশ্চিন্তা লঘু করার জন্য সব সময় ভরসা দেব।" এই মহামারীর দিনে অনেকেই এই শপথ ভুলে গেলেও নির্মাল্য ভুলে যাননি। তাই তো পরিবার পরিজন ছেড়ে হাসপাতালে দিন-রাত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

স্ত্রী ক্যাথরিন স্বামীর অপেক্ষায় থাকেন। ফোনে কথা হলেও দু'জনের দেখা হয় না। দুই বছরের ছোট মেয়েটি প্রতিদিন রাতে বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। গত দুই বছরে বাবা ছাড়া কোনদিন ঘুমায়নি। তাই আজও প্রতিদিন বাবার অপেক্ষায় গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেয়েটি মাকে জিজ্ঞেস করে, মা, আব্বু কখন আসবে?

মা বলেন, দুয়েক দিন পর। তোর জন্য জামা-কাপড়, চকলেট, পুতুল কিনতে গেছে। কেনা হয়ে গেলেই ফিরবে।

মায়ের সান্ত্বনা মেয়েটির কান্না কিছুতেই থামাতে পারে না। কাঁদতে-কাঁদতে সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ভুলে যায় বাবার কথা।

আজ ছোট মেয়ের জন্মদিন। বাসায় যাবে কিনা তাই বসে বসে ভাবছেন। বাসায় গেলেই তো মেয়েটি কোলে উঠতে চায়বে, বুকে জড়িয়ে ধরতে চাইবে। আব্বু বলে ডাকবে আর কাঁদবে। তিনি কি পারবেন সেই ভালবাসা দূরে সরিয়ে রাখতে?

হ্যালো! বাসায় আসতে পারবে? মেয়ে তোমার জন্য কাঁদছে। একবার এসো না।

যাবো ক্যাথরিন। তবে দূর থেকে দেখেই আসতে হবে। আমি চাই না তোমাদের কিছু হয়ে যাক। আমি চাই তোমরা ভাল থাকো।

এসো। অপেক্ষায় আছি।

কি নির্মমতা! করোনা তুমি করুণাহীন। তুমি স্বামীকে তার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ, তুমি সন্তানকে তার বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ, তুমি পরিবারকে সমাজ থেকে দূরে রেখেছ, উপাসনালয়-মন্দির-মসজিদ, স্থল পথ, আকাশ পথ সব কিছু বন্ধ করে দিয়েছ। তুমি সত্যিই করুণাহীন।

নির্মাল্য বিমর্ষ হয়ে ছাদের একপাশে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছেন। এমন সময় ফাদার ফ্রান্সিস নির্মাল্যের কাঁধে হাত রেখে বললেন, চলো খেতে যাই।

ফাদার, খাওয়ার ইচ্ছা নেই।

ডাক্তার সাহেব, কি হয়েছে তোমার? তোমাকে অনেকক্ষণ ধরেই খুঁজছি। ফোনও ধরছিলে না।

নির্মাল্যের চোখে জল এল।

ফাদার, আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। বাসায় গিয়েছিলাম কিন্তু মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারিনি। দূর থেকে দেখেই চলে আসতে হল। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তার সাহেব। ধৈর্য ধরো, অপেক্ষা কর। জানি একদিন সব ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। আবার ছেলে-মেয়েরা খেলায় মেতে উঠবে। টিএসসি মোড়ে যুবক যুবতীদের হাসি গানে মেতে উঠবে, শ্লোগানে মুখর হবে শাহবাগ, গানে-গানে মুখরিত হবে বকুলতলা, রমনার বটমূল, শহীদ মিনার, হাতিরঝিল। মাস্কের পরিবর্তে আবার রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি হবে গোলাপ ফুল। শ্রাবণধারায় খেলা করবে শিশুরা, একই ছাতার নিচে হেঁটে যাবে প্রেমিক যুগল। রিক্সায় ঘুরে বেড়াবে শহরের প্রেমিক-প্রেমিকা।

দরজার কলিং বেল বাজছে। দরজা খুলে দেওয়ার মত কেউ নেই। ফাদার ফ্রান্সিস দরজা খুললেন।

যিশু প্রণাম, ফাদার।

কাঁদতে কাঁদতে এক যুবক বলছে, ফাদার, আমার মা মারা গেছেন। গির্জায় রেখেছি তাকে।

যুবকের সঙ্গে এগারো-বারোজন লোক এসেছে। বুঝতে অসুবিধা হল না তার আপনজন ব্যতীত কেউ আসেনি। তাদের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে ফাদার প্রার্থনা করলেন এবং সমাধিস্থ করলেন। এদিকে যুবকটি বার-বার কেঁদে-কেঁদে বলে যাচ্ছে, ফাদার, আমার মা কি অন্যায় করেছেন? কেন আজ এভাবে মারা গেলেন? কেন তার পাশে কেউ নেই? মা, কত ভাল মানুষ ছিলেন। প্রতিদিন গির্জায় আসতেন, মণ্ডলীর কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন, সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন। তবে আজ কেন এমন হল?

নির্মাল্য একসপ্তাহ ধরে জ্বর-কাশি অনুভব করছেন। কিন্তু বিশ্রাম নেই তার। প্রতিদিনই হাসপাতালে যান। কারণ রোগীরা তার অপেক্ষায় থাকে। আজ পরীক্ষা করে জানা গেল তাকেও করোনাভাইরাসে আক্রমণ করেছে।

হাসপাতালে থাকার কোন সুব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে তাকে ফিরে যেতে হল মিশনেই। চুপি-চুপি তার রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রুমে লাইট জ্বলছে। রুমে লাইট দেখে ফাদার এগিয়ে এলেন।

ডাক্তার সাহেব, শরীর খারাপ? খাওয়া দেব?

ফাদার, কাছে আসবেন না। প্লিস, বাইরে খাবার রেখে যান। আজ থেকে আমাদেরও দূরে থাকতে হবে।

শয্যায় শুয়ে-শুয়ে নির্মাল্য ভাবতে লাগলেন। এক এক করে সবাই দূরে সরে যাচ্ছে। আমার মা-বাবা, স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে, আমার ফাদার, রোগী-হাসপাতাল। আর আমিও এক এক করে সবাইকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে কেবল মৃত্যুই আমায় বরণ করে নিবে। মৃত্যুই কাছে ডাকছে, মৃত্যুই কাছে ছুটে আসছে। জানি না, শেষে কে বরণ করে নেবে আমায়? মৃত্যু নাকি! ■

স্মরণে তোমায়

প্রয়াত গ্লাডিস হার্ড
জন্ম : ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ আগস্ট, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

দিন-রাত্রি পেরিয়ে ঘুরে এলো তোমার মৃত্যুবার্ষিকী। চির শান্তিতে আছ তুমি পিতার স্বর্গরাজ্যে। তোমাকে হারানোর ব্যাথায় আমরা কষ্ট পাই। তোমার শত স্মৃতি জাগিয়ে রাখে আমাদেরকে, দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে মনে করিয়ে দেয় তুমি মরে গিয়েও বেঁচে আছ আমাদের মাঝে। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর এই আমাদের প্রার্থনা।

তোমারই–
ভাইস্তা ও ভাইস্তা বৌ ঃ মাইকেল ব্যান্ডেল ও রীটা বার্ণাডেট পালমা
নাতনী ঃ অর্চি সেবাষ্টিন ব্যান্ডেল

বিপ্র/১৪০/১৮

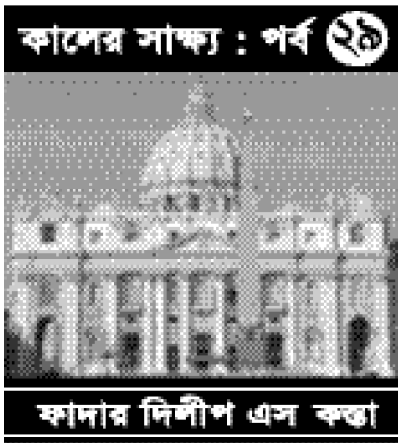

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে মারীয়ার পর্ব

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১৫) ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন (The Assumption of The Virgin Mary into Heaven):

১৫ আগস্ট, মহাপর্ব

প্রৈরিতিক ঐতিহ্য, শিক্ষা এবং বিভিন্ন লেখায় মা মারীয়ার 'আজন্ম আপাপবিদ্ধা' তত্ত্বটি মণ্ডলীতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। "জীবনান্তে ঈশ্বর-জননী অমলোদ্ভবা মারীয়া স্বশরীরে স্বর্গে উন্নীত হয়েছেন"-এই তত্ত্বটি প্রৈরিতিক যুগ থেকেই খ্রিস্টভক্তেরা মেনে আসছে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর পোপ দ্বাদশ পিউস (১৯৩২-১৯৫৮) Munificentissimus Deus নামক নির্দেশনা পত্রের মাধ্যমে মা মারীয়ার স্বর্গারোহণ ধর্মতত্ত্বটি অভ্রান্ত সত্য বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, "ঈশ্বর জননী মারীয়া অমলোদ্ভাবা কুমারী মারীয়া তাঁর ইহকালীন জীবন শেষে স্বশরীরে স্বর্গীয় মহিমায় উন্নীত হন"। যোহন ডামাসিনের (৬৫৭-৭৪৯) মত ও অপরাপর বিখ্যাত ধর্মজ্ঞদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে, খ্রিস্টমণ্ডলী তাঁর জন্ম-মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করে আসছেন, "কুমারী মারীয়া স্বশরীরে স্বর্গোন্নীতা হয়েছেন"।

এছাড়া আদি যুগের জনশ্রুতি বা প্রথায় এই পর্বকে 'মারীয়ার ঘুমিয়ে পড়া'র (Dormition) পর্ব বলা হয়। আদি যুগের কাহিনীতে "যিশুর স্বর্গারোহনের ১২ বছর পর মারীয়া মারা যান বা সেই যুগের ভাষা অনুসারে 'ঘুমিয়ে পড়েন'। মারীয়া কোনদিন কোন রোগে আক্রান্ত হননি। সারা জীবন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। তাঁর আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হল রোগাক্রান্ত হয়ে নয় বরং পুত্র খ্রিস্টের আকর্ষণে।"

"মারীয়া আপন অস্তিত্বের প্রথম মুহূর্ত থেকে পূর্ণ-পাপমুক্ত, তাই তাঁর পুত্রের মতো তাঁরও মৃত্যুর বন্ধন থেকে পূর্ণ-মুক্ত হওয়া চাই। তিনি সকল মানুষের মধ্যে প্রথম সর্ববন্ধন-মুক্ত স্বাধীনতা উপভোগ করেছেন।"

১৬) বিশ্বরাণী মারীয়ার স্মরণ দিবস (The Queenship of the Virgin Mary): ২২ আগস্ট

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউস Ad Caeli Reginam নামক প্রৈরিতিক পত্রের মাধ্যমে 'বিশ্বরাণী মারীয়ার' পর্বটি প্রবর্তন করেন। মারীয়াকে বহু শতাব্দী ধরেই 'স্বর্গের রাণী' বলে শ্রদ্ধা জানানোর প্রথা গড়ে উঠেছিল। মারীয়াভক্ত ফ্রান্সের সন্ন্যাসী সাধু বার্ণার্ড (১০৯০-১১৫৩) ধ্যানময় অবস্থায় মা মারীয়াকে "প্রণাম রাণী, দয়াময়ী জননী, আমাদের জীবন, মাধুর্য ও ভরসা, প্রণাম" বলে ডেকেছেন। পুণ্যবতী মারীয়াকে প্রধানত দুটি কারণে বিশ্বরাণী বলে আখ্যায়িত করা হয়: প্রথমত আদি নর-নারী অবাধ্য হয়ে সৃষ্টিকে কলুষিত করেছেন আর মারীয়া বাধ্যতার গুণে মুক্তির পথ রচনা করেছেন। যিশুর মাতা হয়ে তিনি মুক্তিদাতার সাথে থেকে সহ-মুক্তিদায়ী হয়ে ওঠেছেন। আর যিশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাহাত্ম্যে নতুন জগত সৃষ্টি করেছেন। সেই নব জগতের প্রথম নারী হলেন মারীয়া। দ্বিতীয়ত তিনি হলেন 'বিশ্বরাজ' খ্রিস্টের মাতা। স্বশরীরে স্বর্গন্নীতা হয়ে তিনি পুত্রের বিজয় ও গৌরবের সহভাগিনী মুক্তিসাধনে সাহায্যকারিণী।

সাধু বার্ণার্ড তাঁর বিশ্বাসভরা প্রার্থনায় বলেন, "ওগো মারীয়া, তুমি আমার জন্যে তুমি কতটুকুই বা করতে পার? আর তুমি যদি শুধু আমার রাণী হতে, আমি বলতাম, শক্তিশালিনী তুমি, নিশ্চয় অনেক কিছু করতে পার, কিন্তু কতটুকুই বা আমাকে ভালবাস? কিন্তু তুমি আমার মা-ও, আমার রাণী-ও, তাই আমি একান্ত ভরসার সঙ্গে বলতে পারি, ওগো তুমি আমাকে ভালবেসেই আমার জন্যে কতনা কিছু করবে।" মারীয়ার জীবন ছিল অপাপবিদ্ধ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নেওয়ার মাধ্যমে ভক্তবিশ্বাসীদের নিকট তিনি হয়ে উঠেছেন স্নেহময়ী মা ও শ্রদ্ধার রাণী।

১৭) ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব (The Birth of the Virgin Mary): ৮ সেপ্টেম্বর, পর্ব

জন্মদিন উদ্‌যাপন করার প্রচলন ইহুদী সমাজ তথা অনেক সমাজেই রয়েছে। বিশেষভাবে সমাজ নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয় আনন্দময় পরিবেশে। মণ্ডলীতে পুণ্যবতী মারীয়ার জন্মদিনটি পর্ব হিসেবে পালন করার প্রচলন হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। মারীয়ার জন্ম ছিল জগতের জন্য একটি পরম আনন্দের সংবাদ কারণ তিনি ঈশ্বর-পুত্র মানব-পরিত্রাতা যিশু খ্রিস্টকে জগতে এনেছেন। এই বিষয়ে সাধু যোহন ডামাসিন (৬৫৭-৭৪৯) লিখেছেন: "যেমন সূর্যোদয়ের আগে ঊষা সমস্ত আকাশ রঙিন করে তোলে, তেমনি মানবমুক্তি-দিবাকরের উদয়ের আগে, নির্মলা কুমারী মারীয়ার জন্ম যেন মানব-ভাগ্যাকাশে মুক্তির প্রথম কিরণ।" মানব সমাজে মারীয়া আজন্ম 'আপাপদিদ্ধা'। আর তাই ব্যতিক্রমভাবেই তার জন্ম এবং আজীবন তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবিকা।

১৮) ভেলেঙ্কিনীর মা মারীয়া (Our Lady of Health, Vaelankini)): ৮ সেপ্টেম্বর, পর্ব

দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূলের ভেলেঙ্কিনী মা-মারীয়া তীর্থ স্থানকে 'পূর্বাঞ্চলের লুর্দ' বলা হয়। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে এখানে মা-মারীয়া ছোট এক রাখাল বালকের কাছে তিনবার দর্শন দিয়েছিলেন। প্রতিদিনের মতো বালকটি যখন দুধ নিয়ে তাঁর ক্রেতার কাছে যাচ্ছিল তখন একজন মহিলা তাঁর অসুস্থ শিশুর জন্য বালকের কাছে দুধ চেয়েছিল। বালকটি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর তাঁর পাত্রের সবটুকু দুধ অসুস্থ শিশুর জন্য মহিলাটিকে দিয়েছিল। শূন্য পাত্রটি নিয়ে যখন বালকটি তাঁর ক্রেতার কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করছিল তখন ক্রেতা কিছুটা বিরক্তি বোধ করে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তখন শূন্য পাত্র থেকে দুধ উপচে পড়ে এবং অদূরে একজন মহিলা তাঁর কোলে শিশুকে নিয়ে হাসতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরেই সেই মহিলা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনা জানাজানির পর আশে-পাশের অসুস্থ, অসহায়-রুগ্ন মানুষেরা সেই পাত্রের দুধ পান করার মধ্য দিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। ভক্ত-বিশ্বাসীগণের জানতে আর বাকী রইল না যে কোলের এই শিশুসহ মহিলা হলেন পুণ্যবতী মারীয়া। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস ও সাক্ষ্যদানের পথ ধরেই এখানে প্রথমে একটি চ্যাপেল গড়ে ওঠে। মা মারীয়ার বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের ফলে পরবর্তীতে ভেলেঙ্কীনী স্থানটি ভারতের অন্যতম তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। মারীয়ার মধ্যস্থতায় অনেক মানুষ নিরাময় ও সুস্থ হওয়ায় এই স্থানটি 'অসুস্থদের মা মারীয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে প্রতি বছর ২৮ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় এবং মহাসমারোহে ভেলেঙ্কীনী মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়।

(চলবে)

লায়ার গ্রহে যাত্রা

ইনোসেন্ট ভোর এলেক্স
সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৬ষ্ঠ শ্রেণী

ছোটবেলায় গল্পে শুনেছিলাম একটি গ্রহ আছে। গ্রহটির নাম একটু কেমন যেন; নাম হলো মিছা গ্রহ। সেখানে কেউ সত্য কথা বলে না। আমি যখন একটু বড় হলাম, তখন অনেকগুলো বই ঘাটাঘাটি করে শেষে একটা বইতে খুব কষ্ট করে খুঁজে পেলাম। কিন্তু বইটাতে বিস্তারিত কিছু বোঝানো ছিল না। লেখা ছিল,

এক নতুন গ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে যার নাম লায়ার গ্রহ। প্লুটো গ্রহকে ধ্বংস করে এই গ্রহ তার স্থান নিবে।

আমি চট করে বুঝে ফেললাম যে, এটা সেই গল্পের মিছা গ্রহই হবে। কারণ গ্রহের নাম লায়ার মানে মিথ্যেবাদী, আর গল্পে শুনেছিলাম মিছা গ্রহ, দুটোর নাম প্রায় কাছাকাছি। আমিও তাই মনে করলাম। এরপরও আমি আমার ঘাটাঘাটি থামাইনি। সেটা চালু রেখেছিলাম। পরের বছর যখন প্ল্যানেট সম্পর্কে কোন নতুন বই বের হয়, তখন আমি প্রায় ৫০টির মতো বই কিনি। এই ৫০টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ১টি বইতে লেখা যে,

লায়ার গ্রহ নামে যে গ্রহ তৈরি হচ্ছে তা কিছু মানুষ, যারা স্পেস যাত্রা করার সময় আটকা পরে সেখানে। তখন ভীন্‌গ্রহের মানুষ তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের সমাজের অংশ বানিয়ে ফেলে। তারাই এই গ্রহ দেখাশোনা করে। যারা এই লায়ার গ্রহটি বানাচ্ছে, তারা হলো একজন পুরুষ আর একজন নারী। তাদের পরিকল্পনা হলো, মিথ্যেবাদিদের তারা জন্ম দিবে।

এই লেখাটা পড়ার পরে বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় লেখা ছিল যে, এই সম্বন্ধে কোন ডিটেইলস্ তারা আর দিবে না।

২০৪০ খ্রিস্টাব্দ যখন শুরু হলো, তখন টিভিতে দেখানো শুরু হলো এবং বলা হলো যে, এই লায়ার গ্রহটি তৈরি হতে আরো ৫ দিন সময় লাগবে। কোনো মানুষ যদি স্পেসে যায়, তবে ওই দুইজন মেলিয়েন তাদেরকে হত্যা করবে। মেলিয়েন নামটি বাংলাদেশ থেকে তাদের দেয়া হয়, কারণ মানুষ থেকে তাদের এলিয়েন বানানো হয়।

২০৪৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ওই মেলিয়েনগুলো পৃথিবীতে আসা শুরু করে এবং ঘুরে বেড়াতে থাকে। সব মানুষজন তখন ভয়ে কাবু হয়ে ঘরে পালায় এবং ভয়ে ঘর থেকে আর বেরোয় না। মানুষের এই ভয় দেখে মেলিয়েনগুলো সুযোগ পেয়ে অ্যাটাক শুরু করে। তারা ভীতুদের পছন্দ করে না। মেলিয়েনগুলো তখন মানুষজনদের মাঝে নানা রকম মিথ্যা ছড়াতে থাকে। তারা মুখ খুলে হাওয়া বের করার সময় মিথ্যাগুলো ছড়িয়ে যায়। এই মিথ্যা ছড়িয়ে মেলিয়েনগুলো আবার তাদের গ্রহে ফিরে চলে যায়। কিন্তু ঠিক তারপরের দিন থেকে দেখা গেল যে, সর্বোচ্চ মানুষেরাই মিথ্যা কথা বলা শুরু করে দিয়েছে এবং তা হলো ডাহা মিথ্যা কথা। যাকে বলে ভয়ানক মিথ্যা কথা সব। এভাবে অনেক দিন চলতে থাকে। যারা এই মিথ্যা কথা বলা রোগে ভুগছিল, তারা বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী মানুষদের কাছে চিকিৎসা করিয়ে কিন্তু আজও পর্যন্ত সুস্থ হতে পারে নাই।

২০৫১ খ্রিস্টাব্দে আমার মন নাচিনাচি শুরু করে দিল লায়ার গ্রহে যাবার জন্যে। আমার এক বন্ধু নাসায় চাকুরী করে। তার সাথে আমি যোগাযোগ করলাম। সে আমাকে বলে, তুই কি পাগল নাকি! ঐখানে যাওয়া নিষেধ তুই জানিস না? ঐখানে গেলে মানুষদের মেরে ফেলে মেলিয়েনরা। আমি নাছোড়বান্দার মত ওকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম। অতপর বন্ধু আমার কোনো রকমভাবে রাজি হলো। আমাকে এক শর্ত দিয়ে বললো, দেখ, ঐখানে গেলে যদি আমাদের কোন ক্ষতি হয়? এর দায়-দায়িত্ব কিন্তু আমার নয় এবং তুই এই যাওয়া আসার সমস্ত টাকা দিবি।

অবশেষে আমি আমার সঙ্গে আরও ২ জনকে নিয়ে ঐ গ্রহে যাই। একজন সাইন্টিস্ট এবং একজন এলিয়েন বিশেষজ্ঞ। দুজনই প্রথমে যেতে আপত্তি করলেও আমি তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেতে রাজি করাই। তারা প্রথমে একটু ভয় ভয় করছিলো বটে। সাইন্টিস্ট বলে উঠলো, "দোস্ত, আমার কাছে এমন একটা গ্যাজেট আছে যার মাধ্যমে মেলিয়েনগুলো আমাদের দেখে তাদেরই বংশধর মনে করবে।

সেই গ্যাজেটটি পড়েই আমরা লায়ার গ্রহের দিকে যাচ্ছি। আমাদের স্পেসশীপটা এক সময় লাইয়ার গ্রহে এসে থামলো। আমরা চারজন স্পেসশীপ থেকে নেমে লায়ার গ্রহে পা রাখলাম। ভাগ্যিস, আমরা গ্র্যাভিটি জুতো পরে ছিলাম। নয়তো শুন্যে ভাসতে থাকতাম। কারণ, লায়ার গ্রহের মেলিয়েনগুলো ভাসতে ভাসতে চলাফেরা করে না। গ্রহে পা রাখতেই দেখলাম যে, গ্রহটি তুলোর থেকে নরম।

অনেকক্ষণ হাঁটতে-হাঁটতে একটা গেট চোখে পড়লো। গেটের পাশে সৈনিকের পোষাক পড়ে দুইজন মেলিয়েন দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তাদের সামনে গেলাম। তারা আমাদের চারজনকে স্ক্যান করলো এবং মুখে বলল, স্বাগতম মেলিয়েন। আমি এদের দেখেই বুঝলাম, এরা সত্যই মেলিয়েন। যে নাম বাংলাদেশের মানুষেরা দিয়েছিল। আমাদের স্ক্যান করার পর আমরা হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে ঢুকে তো আমরা অবাক হয়ে গেলাম। এ দেখি নিখুঁত শিল্পীর হাতে গড়া একটি সুন্দর চিত্র। কি সুন্দর-সুন্দর সব আধুনিক টাইপের ঘর-বাড়ি। চোখে পড়ল আরো বিভিন্ন রকমের মেলিয়েনদের। আমি এদের দেখে সব বর্ণনাকারে বলতে থাকলাম আর এক বন্ধু লিখতে লাগলো। মাথাটা সবুজ, কিন্তু গঠন আমাদের মতন, চোখ দুটো লাল, কিন্তু গঠন ঠিক আমাদের মতন। প্রত্যেকেই চিকন-চাকন কাঠি। তাদের পেট থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঠিক এলিয়েনের মতো। শুধু মাথা থেকে বুক পর্যন্ত মানুষের মতো। সম্পূর্ণ অঙ্গ সবুজ রঙের। নারী-পুরুষ সবাই প্রায় একই রকম। শুধু নারীদের মাথায় চুল আছে।

যতগুলো দালান আছে তার মধ্যে একটি সোনালি রঙের। আমার এক বন্ধু, যে নাসায় চাকুরী করে, সে একটা ক্যামেরা নিয়ে এসেছিল। সে এখানের সবকিছু রেকর্ড করে রাখছিল। তার ইচ্ছে এই ছবি এবং ঘটনাটি পৃথিবীতে গিয়ে ছড়িয়ে দিবে এবং একজন নামকরা বিখ্যাত লোক হয়ে যাবে।

সোনালি রঙের দালানটি দেখে আমাদের আগেই একটা কৌতূহল ছিল। এক সময় তার মধ্যে আমরা ঢুকলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি, দুইজন মেলিয়েন একজন নারী আর একজন পুরুষ ভাসমান জায়গায় বসে আছে। তাদের চারপাশে উড়ন্ত মেলিয়েনরা মিথ্যা কথা বলে বলে গান করছিলো। তারা গাইছিল,

দুইজন পাগলের ক্ষতি হোক,

এই দুই অপরাধীদের ক্ষতি হোক।

এই গান শুনে রাজা রাণী খুব খুশী হচ্ছিল। তারা মিথ্যা বললে এবং শুনলে খুব খুশী হতো। পুরো গ্রহটা এই রাজা-রাণী নিয়ন্ত্রণ করে। আমার এলিয়েন বিশেষজ্ঞ বন্ধু ট্রান্সলেটর যন্ত্র দিয়ে তাদের সাথে কথা বলে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো, এরা মিথ্যা বলে তাই এই গ্রহের নাম লায়ার গ্রহ। সে যখন মেলিয়েনদের কাছে সত্য বলতে বলল, তখন এক মেলিয়েন জানতে চাইলো যে, সত্য জিনিসটা কী? বন্ধুটি বললো, সত্য হল বিশ্বাস এবং বাস্তব। বাস্তবতাকে বিশ্বাস করতে হবে। তখন সে আমাদের বললো, মিথ্যার মধ্যে জন্ম নিয়ে সত্য কি জিনিস তা তারা জানেই না। এদের সত্য শিখানো ছাড়া তো উপায় নাই। নাসার বন্ধুটি সব রেকর্ড করছিল। আমরা এই সত্য শেখাতে গিয়ে প্রথমে বেশ মার খেলাম। আসলে সত্য কথা শিখাতে গেলে প্রথম-প্রথম সবাই একে অপরের কাছে গালমন্দ খেতেই হয়। সত্য প্রতিষ্ঠা হলে তখন আস্তে-আস্তে সব ঠিক হয়ে যায়। আর মেলিয়েনরা সব কিছুই চট করে ধরে ফেলতে পারে।

নাসার বন্ধুর হাতে ক্যামেরা দেখে এক মেলিয়েন সেটা কেড়ে নিয়ে মোচড় দিয়ে ভেঙে ফেললো। বন্ধুটি খুব রাগ করলো। আমি তাকে বুঝালাম যে এখানে রাগ দেখিয়ে কোন লাভ হবে না; আমাদের আরো ক্ষতি হবে। বন্ধুটি আমার কথাটা মেনে নিলো।

অবশেষ আমরা লায়ার গ্রহ থেকে সুস্থভাবেই পৃথিবীতে ফিরে এলাম এবং ঐ গ্রহটির নাম দিলাম প্লুটো নাম্বার-২। এই গ্রহ আর লায়ার গ্রহ রইলো না। এমনকি, পৃথিবীর মানুষেরাও সবাই সুস্থ হয়ে সত্য কথা বলতে লাগলো॥ ■

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল (The Season of Creation)

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল (The Season of Creation) এমন একটি সময় যখন আমরা উদ্‌যাপন, পরিবর্তন ও বিভিন্ন অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির সাথে আমাদের সম্পর্ক নবায়ন ঘটায়। সৃষ্টি উদ্‌যাপন কালে বিভিন্ন মণ্ডলীর ভাইবোনেরা সকলের বাসভূমি এই ধরণীর জন্য প্রার্থনায় ও কাজে একত্রিত হয়। একুমেনিকাল পাট্রিয়ার্ক ১ম দিমিত্রিউস ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ঘোষণা করেন ১ সেপ্টেম্বর অর্থডক্স মণ্ডলীতে সৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হবে। প্রকৃতপক্ষে ঐদিন থেকেই অর্থডক্স মণ্ডলীতে ১ সেপ্টেম্বর স্মরণ করা হয় ঈশ্বর কিভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব চার্চ পরিষদ (World Chuch Councils) সৃষ্টির এই বিশেষ দিনকে কালে প্রসারিত করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। তাই এখন তা উদ্‌যাপিত হচ্ছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত। একুমেনিকাল পাট্রিয়ার্ক ১ম দিমিত্রিউস ও বিশ্ব চার্চ পরিষদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে, বিশ্বের খ্রিস্টানগণ তাদের বার্ষিক কালপুঞ্জিতে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কালকে গ্রহণ করেছে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস রোমান কাথলিক মণ্ডলীতে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কালকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সময়ে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মীয় নেতৃবর্গ তাদের ভক্তদের অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছেন মাসব্যাপী সময়কালে সৃষ্টির প্রতি আরো বেশি যত্নশীল হতে।

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল শুরু হয় ১ সেপ্টেম্বরে সৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে এবং শেষ হয় ৪ অক্টোবর, জীব-পরিবেশবিদ্যার প্রতিপালক বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রিয় আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব দিবসে। মাসব্যাপী উদ্‌যাপনে আমাদের সকলের আবাসভূমির যত্নদানে বিশ্বের ২.২ বিলিয়ন খ্রিস্টান একত্রিত হবে।

প্রতিবছর একুমেনিকাল স্টিয়ারিং কমিটি সৃষ্টির উদ্‌যাপন কাল পালন করতে একটি মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে যা বৈশ্বিক খ্রিস্টান সমাজকে একত্রিত করে। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: ধরিত্রীর জন্য জয়ন্তী। কাথলিক মণ্ডলী মূলভাবের সাথে একটু যোগ করে প্রতিপাদ্য বিষয় করেছে:- 'ধরিত্রীর জন্য জয়ন্তী: নতুন ছন্দ, নতুন আশা।'

এ বছরে সারাবিশ্বকে কাঁপিয়ে দেওয়া সঙ্কটের মধ্যেও সৃষ্টি এবং পরস্পরের মধ্যে নিরাময়ের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়েছে। এ বছরে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল সময়সীমাতে আমরা পুনরুদ্ধার ও আশা নিয়ে আমাদের ধরিত্রীর জন্য জয়ন্তীতে প্রবেশ করি, যা মূলত সৃষ্টির সাথে নতুনভাবে জীবন-যাপন প্রত্যাশা করে। বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টানরা এই সময়টিকে স্রষ্টা ও সমস্ত সৃষ্টির সাথে উদ্‌যাপন, রূপান্তর এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার মাধ্যমে তাদের সম্পর্ককে নতুন করে তুলতে ব্যবহার করবে। এ বছরে

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পৃথিবীর জন্য বিশ্রাম ও পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিবেচনা করে।

গত বছরের সৃষ্টি উদ্‌যাপন কালের প্রারম্ভে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বার্তায় বলেন, ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বরের সন্তান এবং সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে এখনই আমাদের আহ্বান পুনআবিস্কার করার সময়। বাইবেলের আদিপুস্তক থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বর্ণনা করেন, ঈশ্বর ভালবাসায় তাঁর সৃষ্টিতে বিশ্রামরত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মানুষ পাপ, স্বার্থপরতা এবং অধিকার ও শোষণ করার লোভী মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের সে ভালবাসার প্রতিক্রিয়া দেখায়। পারস্পরিক সাক্ষাতের ও সহভাগিতার স্থান পৃথিবীকে আমিত্ববোধ ও স্বার্থ প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের স্থানে পরিণত করেছে। এমনিভাবে পরিবেশও বিপন্ন হচ্ছে। বৈশ্বিকভাবে পরিবেশের অবনতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা অনেক সময়ই ভুলে যাই আমরা কে: ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট সৃষ্টি। সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালন করতে পোপ মহোদয় সকল ভক্তকে প্রার্থনা, অনুধ্যান ও বাস্তবধর্মী কাজ করতে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পোপ ফ্রান্সিসের সাথে একাত্ম হয়ে ইয়াঙ্গুনের আর্চবিশপ এবং এফএবিসি'র প্রেসিডেন্ট, কার্ডিনাল চার্লস মং বো এশীয় মণ্ডলীর কাছে বিশেষ আবেদন রাখেন এই কোভিড -১৯ সঙ্কটকালেও সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল যেন তাৎপর্যপূর্ণভাবে পালিত হয়। ২২ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিত এক পত্রে তিনি এই অনুরোধ রাখেন। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য 'ধরিত্রীর জন্য জয়ন্তী: নতুন ছন্দ, নতুন আশা' - বিষয়টি এশীয়দের আশাবাদী করে পৃথিবীকে নবীকরণের ধারায় আনয়নের সাক্ষী হতে। পরিবার, ধর্মপল্লী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন ও ধর্মপ্রদেশগুলোতে কাজের মাধ্যমে আমরা আমাদের সকলের আবাসভূমির সাথে নিরাময় ও নতুনভাবে সম্পর্ক খুঁজি। আমরা পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীনপত্র 'লাউদাতো সি' থেকে পরিবেশগত রূপান্তর বিষয়ে অনুপ্রাণিত হই।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট ও ঢাকার আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি বাংলাদেশ মণ্ডলীর সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গকে উদাত্ত আহ্বান করছেন যেন সকলে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল (The Season of Creation) কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করে বিশ্ব চার্চ পরিষদ, গ্লোবাল কাথলিক ক্লাইমেট মুভমেন্ট, এসিটি এলাইয়েন্স, ওয়ার্ল্ড কম্যুনিয়ন রিফর্মড চার্চেস, এ রোচা, লুথেরান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন, খ্রিস্টিয়ান এইড, ইউরোপীয় খ্রিস্টান এনভাইরনমেন্টাল নেটওয়ার্ক।

- তথ্যসূত্র : news.va, FABC পত্র

নিউ জার্সিতে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন

জেমস গমেজ (আদি) ▮ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের জার্সিসিটির আওয়ার লেডী অফ মাউন্ট কর্মেল চার্চে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসির জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। উক্ত দিনে ঈশ্বরের সেবকের স্মরণে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদি)। খ্রিস্টযাগের শুরুতে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর পরিবার, মারীয়া সেনা সংঘের সদস্যবৃন্দ, সোসাইটি অফ সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পলের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ শোভাযাত্রা করে বেদীর সামনে এসে ফুল দিয়ে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ছবির সামনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদি) আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জীবনাদর্শ থেকে তার পবিত্রতা, প্রার্থনাশীল জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ধার্মিকতার উপর ভিত্তি করে উপদেশ দেন। উল্লেখ্য ফাদার স্ট্যানলী দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত নিউ জার্সিতে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকীর খ্রিস্টযাগ দিয়ে যাচ্ছেন (১৯৯৫-২০২০)।

খ্রিস্টযাগের শেষে গির্জার স্থানীয় হলে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। উল্লেখ্য আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর প্রিয় খাবারগুলো নিউ জার্সির খ্রিস্টভক্তগণ রান্না করে আনেন। চা-চক্রে ছিল বিভিন্ন পিঠা-পায়েস। এরপর ফাদার স্ট্যানলী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আর্চবিশপের জন্মশতবার্ষিকী পালনে ফাদার স্ট্যানলী, গাঙ্গুলী পরিবারসহ সেনা সংঘ ও সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের সদস্য-সদস্যাগণ সমবেত হয়ে কেক কাটেন। ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'ঐশ সেবক' নামে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এ স্মরণিকা প্রকাশে ও জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে যারা বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলেন ফাদার স্ট্যানলী তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালনের বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রস্তুতি স্বরূপ বিগত একটি বছর ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ নিউ জার্জির মারীয়া সেনা সংঘের সকল সদস্যা, খ্রিস্টভক্তগণ অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ফাদার স্ট্যানলি গমেজ (আদি) বিভিন্ন বাড়িতে-বাড়িতে মালা প্রার্থনা, আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর জীবনাদর্শ আলোচনা ও বিভিন্ন বই থেকে তার সম্পর্কীয় বিভিন্ন ঘটনা পড়ে শুনান এবং সহভাগিতা করেন॥

খাগড়াছড়ি ভাইবোন ছড়ায় মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব পালন

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▮ গত ১৬ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে খাগড়াছড়ি, মারমাপাড়ার ভাইবোনছড়ায় যথাযথ সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করে নির্মল হৃদয় মা মারীয়ার গির্জায় মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব পালন করা হয়।

পর্বদিনের মূলসুর ছিল- "স্বর্গোন্নীতা মা মারীয়ার কৃপা আশীর্বাদ মর্তবাসী সবার ওপর বর্ষিত হোক।" এ উপলক্ষে স্থানীয় ক্যাটেখিস্ট দয়া মোহন ত্রিপুরা 'নির্মল হৃদয়' কথাটির অর্থ এবং মা মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সহজ-সরল ও স্থানীয় ভাষায় উপস্থাপন করেন। এরপর সম্মিলিতভাবে জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে মা মারীয়ার কৃপা আশীর্বাদ যাচনা করা হয়। জপমালা প্রার্থনা করার পর শোভাযাত্রা করে সকলে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার রবার্ট গনসালভেছ বলেন, মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন আমাদের জন্য মঙ্গলদায়ক। স্বর্গের সুবাস, প্রেমময় আনন্দ ও গৌরবে আচ্ছাদিত হয়ে নতুন পরশে স্বর্গোন্নীতা হয়ে স্বর্গের রাণীর মুকুট লাভ করে সুশোভিত হয়েছেন। মা মারীয়ার মাতৃত্ব সেবাকাজে একনিষ্ঠতা, বাধ্যতা, নম্রতা, পবিত্রতায় ও শুচিতায় মা মারীয়া ঈশ্বর জননী ও আমাদের সবার মা।

পরিশেষে, কোভিড-১৯ হতে সকলের রক্ষা ও শান্তির জন্য প্রার্থনা এবং টিফিনের মধ্য দিয়ে উক্ত পার্বন উদ্‌যাপনের সমাপ্তি ঘটে॥

সাধু ডন বস্কোর জন্মদিন উদ্‌যাপন

সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি (খঞ্জনপুর ধর্মপল্লী) ▮ গত ১৬ ও ১৭ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রোজ রবিবার ও সোমবার যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীতে সাধু জন বস্কের ২০৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। সকাল ৭:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ডন বস্কো সেমিনারীর পরিচালক ফাদার জোস্ পামপাডিল এসডিবি। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন, "ডন বস্কো গরিব পরিবারের সন্তান হয়েও, সমাজে উঁচু স্থান করেছেন এবং আত্মপ্রয়াসে ও ঈশ্বরের দয়ায় তিনি কত করুণাধারা এই জগতে এনেছেন"। তিনি আরও বলেন, ডন বস্কোর শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রভাব আধুনিক যুগের যুব সমাজের মানবিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে উজ্জ্বল করুক এই আশা রাখছি।

খ্রিস্টযাগ শেষে কেক কাটা হয়। এরপর ধর্মপল্লীর প্রাঙ্গনে উক্ত দিবস উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দিন সকাল ৯:৩০ মিনিটে শুরু হয় বস্কো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিচালক ফাদার জোস্ এসডিবি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার যোসেফ ফাম এসডিবি এবং রিজেন্ট সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ডন বস্কো প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, ডন বস্কো যুব সমাজ এবং অ্যাসপাইরেন্টরা ইংরেজীতে গান, নৃত্য ও নাটিকা উপস্থাপন করেন। পরিশেষে পুরস্কার ও মিষ্টি বিতরণ করার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

তন্ময় গমেজ (চালাবনে) ▮ ১৬ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চালাবন ডনবস্কো কাথলিক মিশনে সাধু ডন বস্কোর জন্মদিন পালিত হয়। উক্ত দিনে বিকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি এবং খ্রিস্টযাগ শেষে কেক কেটে জন্মোৎসব পালিত হয়। এবং আহারের পর সকল খ্রিস্টভক্তের জন্যে কুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চালাবন ডন বস্কো যুব সংঘের যুবারা এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং পরিশেষে প্রার্থনার মধ্যে বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি॥

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব পালন

সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি ▮ গত ১৫ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, মহাসমারোহে মারীয়া আমাদের সহায় ধর্মপল্লীতে স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় বিকাল ৫:৩০ মিনিটে শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে। শোভাযাত্রার পর বেদিতে ধূপারতি দেওয়া হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার যোসেফ ফাম এসডিবি এবং সহায়তা করেন ফাদার জোস্ পামপাডিল এসডিবি। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার ফাম বলেন, "এই পৃথিবীতে মারীয়া তার জীবন শেষ করেন, তিনি শরীরে ও আত্মায় স্বর্গে উন্নীত হয়েছিলেন এবং তাকে দেওয়া হয়েছিল স্বর্গীয় মহিমা, যেখানে আমাদের প্রভু যিশু তাঁকে স্বর্গের রাণীর মুকুট পরিয়ে দেন"।

তিনি আরও বলেন, "মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মারীয়া এইভাবে সম্পূর্ণরূপে জাগতিক সবকিছু থেকে মুক্তি লাভ করেন, তাই পৃথিবীর মৃত্যু, পচন, যেগুলি আসলে আমাদের আদি পাপের ছোঁয়া বলে গণ্য- কোন কিছু তাকে স্পর্শ করে না"। খ্রিস্টযাগের শেষ আশীর্বাদের আগে খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ফাম খ্রিস্টযাগকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ করতে যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার ফামের জন্মদিন পালন করা হয় কেক কাটার মধ্যদিয়ে। ধর্মপল্লীতে মহাপর্ব উপলক্ষে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসেবে ৯ দিনব্যাপি নভেনা ও রোজারীমালা প্রার্থনা করা হয়॥

ভুল সংশোধনী

প্রতিবেশী সংখ্যা - ৩০, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

- ১৬ নং পৃষ্ঠা ২য় কলামের প্রথম থেকে ৮ম লাইনে '৪২জন পুরোহিত তরুণ' এর স্থলে '৪২ জন পরহিত তরুণ' পড়তে হবে।
- ১৬ নং পৃষ্ঠা ২য় কলামের ১ম প্যারার শেষে '(০১৭৫২/০৭৪৪৯৭, ০১৬২২৯২৯৩৯৭, ও ০৯৬১১/১৭/৪৩/০৪)' এর স্থলে '(০১৭৫২০৭৪৪৯৭, ০১৬২২৯২৯৩৯৭, ও ০৯৬১১১৭৪৩০৪)' পড়তে হবে।

অনাকাঙ্ক্ষিত বানান ও তথ্যগত ভুলের কারণে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রেজিঃ নং : ৩৭৫/১৯৮২

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ০৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আঠাগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সন্মানিত সকল সদস্য / সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ৬ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে অত্র সমিতির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৪:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।** উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের ১জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১জন সেক্রেটারী, ১জন ম্যানেজার, ১জন ট্রেজারার ও ৪ জন সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষেদও নির্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহনের জন্য সদস্য/সদস্যাদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সভার কর্মসূচী

১। নাম ডাক ২। আসন গ্রহণ ৩। জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন ৪। প্রারম্ভিক প্রার্থনা ও সমিতির মৃত সদস্য/সদস্যাদের আত্মার স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন ৫। সভাপতির স্বাগত ভাষণ ও সভার উদ্বোধন ৬। সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণের জন্য সেক্রেটারী নিয়োগ ৭। ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন ৮। সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিষদের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ৯। ম্যানেজার কর্তৃক বার্ষিক আর্থিক হিসাব রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ১০। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট, ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ ও অনুমোদন ১১। পর্যবেক্ষণ পরিষদের রিপোর্ট পেশ ১২। ঋণদান পরিষদের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ১৩। বিবিধ / মুক্ত আলোচনা, ১৪। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ১৫। ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন ১৬। মধ্যাহ্ন ভোজ ২১। লটারী ও সমাপ্তি।

ধন্যবাদান্তে,

জন পিরিজ
চেয়ারম্যান
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

গডফ্রে আন্তনী গমেজ
সেক্রেটারী
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিপ্র/১৩৭/২০

২০তম মৃত্যুবার্ষিকী

স্তুতি বৃজেট গমেজ

জন্ম : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ আগস্ট, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

মোর একটি কুসুম
ক্ষণিকের ভুলে,
পাষাণ দেবতা
নিয়ে গেছে তুলে।
বিশটি বছর পরে
আজো মনে পড়ে,
আছো তুমি সবার হৃদয় জুড়ে
আছো মনের গভীরে॥

অনেক অনেক আদর, ভালোবাসা ও চুমু

মা-বাবা : পল্লিকা ও আলেকজান্ডার গমেজ
ভাই বোন : ঐশী, অর্ঘ্য ও দ্যুতি গমেজ

বিপ্র/১৩৮/২০

মা-মারীয়ার জন্মতিথি ও সেনাসংঘ দিবস

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার মা-মারীয়ার জন্মতিথি ও 'সেনাসংঘ দিবস'। মা মারীয়ার জন্মদিন মারীয়ার সেনাসংঘের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই বাংলাদেশের সকল সেনাসংঘের সদস্য-সদস্যা ভাইবোনদের যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য ঢাকা কমিশিয়ামের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মা-মারীয়ার জন্মদিন ও সেনাসংঘ দিবস সকলের জন্য বয়ে আনুক শান্তি সমৃদ্ধি ও মা মারীয়ার আশীর্বাদ।

ধন্যবাদান্তে,

ঢাকা কমিশিয়ামের সকল সদস্য-সদস্যাবৃন্দ
ঢাকা, বাংলাদেশে

বিদ্রঃ প্রত্যেক প্রেসিডিউম একত্রে তাদের সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে আনন্দের সাথে মা-মারীয়ার শুভ জন্মদিন উদ্‌যাপন করবেন।

বিপ্র/১৩৯/২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩১
প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

স্মৃতিতে অম্লান তুমি

দেখতে দেখতে ছয়টি বছর কিভাবে কেটে গেল! গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪-তে ঢাকা স্কয়ার হাসপাতালে **ক্যাথরিনা কাকলী গমেজ** আমাদের ছেড়ে পরম করুণাময়ের কাছে চলে গেছেন। তোমার অভাব জীবন চলার প্রতিটি ধাপে অনুভূত হয়, অনেক অসহায় মনে হয়। যেখানেই যাই আর যা কিছুই করি তোমার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তোমাকে আমরা রাখতে পারিনি। বাগানের প্রিয় ফুলটি ঈশ্বরকে দিয়েছি ভেবে মনকে সান্ত্বনা দেই। পরম করুণাময় পিতা তোমাকে অবশ্যই স্বর্গে স্থান দিয়েছেন। তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো আমাদের মধ্যে যেন শান্তি ফিরে আসে, সন্তানদের যেন তোমার ইচ্ছানুযায়ী ভাল মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি। তোমার ক্যান্সার-এর চিকিৎসার সময় যারা দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও প্রার্থনা করি। তোমার স্মৃতি ও ভালবাসা আমাদের মধ্যে সব সময় অটুট থাকবে। ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গে সুখী করুন।

ক্যাথরিনা কাকলী গমেজ
জন্ম : ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

এই কামনায়–
পলাশ ডেজমন্ড গমেজ
ও ক্যাথরিনা প্রভা গমেজ
ছেলে : ডিভাইন ও মেয়ে : সুপ্রিতা
মা : লিলিয়ান নীলু গমেজ
এবং পরিবারবর্গ
রোনাল্ড হাউস, হাসনাবাদ, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৩৪/২০

শোকাহত

আমাদের মা শ্রদ্ধেয়া **লুইজা রেখা গমেজ** কাফরুল (হাসনাবাদ ছিটার বাড়ি) নিবাসী গত ১৮ আগস্ট সকাল ১০:৩০ মিনিটে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোকগমন করেছেন। তিনি গত ১২ বছর যাবত কিডনী রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং ৬ বছর যাবত স্কয়ার হাসপাতালে ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়ায় চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মায়ের মৃত্যুর পর যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন, তাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার আত্মার শান্তির জন্য সকলের কাছে প্রার্থনার অনুরোধ করছি।

লুইজা রেখা গমেজ
জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৩৫/২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 31
Regd. No. DA-33
❖ 30 August - 5 September, 2020 , ১৫ - ২১ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

নিরাপদ থাকুন, নিরাপদ রাখুন।
স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজে নামুন।

প্রচারে : SIGNIS BANGLADESH

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির আকর্ষণীয় সম্ভার।

✶ রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি ✶ পানপাত্র ✶ আকর্ষণীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা

✶ এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই এছাড়াও যা পাওয়া যাচ্ছে –

❒ খ্রিস্টযাগ রীতি ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই

❒ কাথলিক ডিরেক্টরী ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ ❒ যুগে যুগে গল্প ❒ সমাজ ভাবনা

আপনাদের পরিবার খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় দ্রবাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

শিঘ্রই পাওয়া যাবে

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রতিবেশী প্রকাশনী দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১ - BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book) ভারত থেকে আমদানী করছে। তাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আজই অর্ডার দিন।

প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেল ভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার ছাপার প্রস্তুতি নিচ্ছে।** আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনটি প্রতিবেশী প্রকাশনীর ক্যালেণ্ডারে প্রকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**